দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

আচার্য প্রণবানন্দজী
এক দূরদর্শী হিন্দু সন্ন্যাসী
— পৃঃ ৩৭

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত
একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘ
— পৃঃ ৩৫

৭৭ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা।। ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।। ২৭ মাঘ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ২৭ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১০ ফেব্রুয়ারি - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

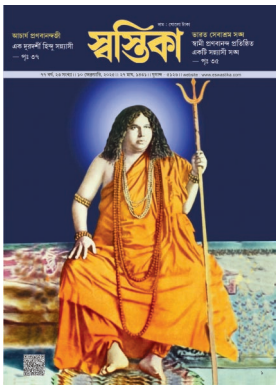

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

অভয়া তদন্ত আরও গতি পাবে, কারণ পদ্ধতিতে পরিণাম যথার্থ হয় : অন্তর্ধান ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দেবী সরস্বতী এলেন, বাধাও পেলেন, জয় বাংলা ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ভণ্ড কংগ্রেস এবং তাদের নকল বাবাসাহেব প্রীতি ◻ বলবীর পুঞ্জ ◻ ৮

অ্যারো ইন্ডিয়ায় ধামাকা ভারতের : চীন-পাকিস্তানকে টেক্কা দেওয়ার প্রস্তুতি সারা ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তর্ভুক্তি ও বিতর্ক ◻ ধর্মানন্দ দেব ◻ ১১

হিন্দু বিদ্বেষী বিকাশ-খাড়গেরা যেন শ্রীচৈতন্য যুগের জগাই-মাধাই ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১৩

বাংলাদেশ ইসলামীকরণের দিকে যাচ্ছে, পাকিস্তানের চেয়েও দ্রুততর বেগে ◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ১৪

জাতীয় জীবন-মরণ সমস্যায় আজও অপরিহার্য যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের পথনির্দেশ ◻ ড. দীনেশ চন্দ্র সিংহ ◻ ১৭

স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ এবং শৈবতন্ত্রের গুরু পরম্পরা ◻ রণজয় বিশ্বাস ◻ ১৯

শিক্ষা পোর্টালের হাতযশে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুলছুটের সংখ্যা শূন্য ◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ২০

সংসারী ও সন্ন্যাসী : যুগাচার্য—ভারতকেশরী : সঙ্গ প্রসঙ্গ ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘ ◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৫

আচার্য প্রণবানন্দজী—এক দূরদর্শী হিন্দু সন্ন্যাসী ◻ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৩৭

মাঘী পূর্ণিমার তাৎপর্য ◻ সূর্যশেখর হালদার ◻ ৩৯

এক দুশ্চরিত্র লম্পট নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লা ◻ ওম প্রকাশ ঘোষ রায় ◻ ৪৩

ড. ইউনুস এখন বাংলাদেশের শান্তিকামী মানুষের 'গলার কাঁটা' ◻ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ৪৬

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০** ◻ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯**

প্রকাশিত হবে
১৭ ফেব্রুয়ারি
২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৭ ফেব্রুয়ারি
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-২৬

গত ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছেন। বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এই বাজেট। সেই সঙ্গে আগামীদিনে বিশ্ব অর্থনীতিতে উন্নততর স্থান লাভের লক্ষ্যে ভারতের যাত্রা শুরু।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের এবারের বাজেট নিয়ে আলোচনা করবেন ড. রতন ঘোষাল, অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ, অর্থনীতিবিদ সুদীপ্ত গুহ, অধ্যাপক ড. পঙ্কজ কুমার রায়, কর্ণেল ড. কুণাল ভট্টাচার্য, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments
From-

A
Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দুজাতির রক্ষাকর্তা

হিন্দুজাতির রক্ষকর্তা বলিয়া যদি কোনো ধর্মীয় গুরুকে অভিহিত করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে তিনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করিবার কারণে হিন্দুদিগের প্রতি মুসলমানদের জেহাদি মানসিকতার প্রকাশ কৈশোরকালেই তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি কোনোরূপ অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না। হিন্দুর প্রতি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি রুদ্ররূপে দাঁড়াইতেন। বাস্তবিক অর্থেই তিনি রুদ্রাবতার ছিলেন। বাল্যবয়সেই তিনি সাধন ভজনে নিমগ্ন থাকিতেন। কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্যের সাধনা করিতেন। তিনি মনে করিতেন ব্রহ্মচর্যের শক্তিতে জগৎ জয় করা অসম্ভব নহে। সঙ্গীসাথীদের মনেও তিনি ব্রহ্মচর্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিতেন। পরিণত বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ নামে তিনি বাঙ্গালি তথা ভারতবাসীর নিকট পরিচিত হইয়াছেন। ঈশ্বর লাভ তাঁহার লক্ষ্য হইলেও তিনি মনে করিতেন দেশ, জাতি ও সমাজ সর্বাগ্রে। তিনি বিশ্বাস করিতেন, হিন্দুজাতি সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইলেই দেশের স্বাধীনতা শীঘ্র প্রাপ্ত হইয়া তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইবে। স্বাধীনতা নিমিত্ত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগ ছিল। ইহার কারণে তাঁহাকে ব্রিটিশ পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হইয়া কারারুদ্ধও হইতে হইয়াছিল। তিনি হিন্দু জাতিগঠনকে সর্বোপরি স্থান দিয়াছেন। হিন্দুসমাজের সর্বপ্রকার ভেদভাব নির্মূল করিবার প্রয়াস তিনি সারাজীবন করিয়াছেন। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদিগকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের পাকান্ন স্বয়ং ভক্ষণ করিয়াছেন। মাঘীপূর্ণিমার দিনে তাঁহার আবির্ভাব এবং মাঘীপূর্ণিমার দিনেই তাঁহার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি গ্রামে গ্রামে হিন্দু মিলন মন্দির স্থাপনা করিয়া হিন্দু রক্ষীদল গঠন করিয়াছেন। এই হিন্দু রক্ষীদলের যুবকবৃন্দ পূর্ববঙ্গে জেহাদি গুন্ডাদের আক্রমণ হইতে হিন্দুদিগকে রক্ষা করিতে সদা তৎপর থাকিতেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাধ্যমে তিনি সেবাধর্মের প্রচার ও প্রসার করিয়াছেন। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও রক্ষীদলকে যেকোনো দুর্গম স্থানেও সেবাকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। উল্লেখ করিবার বিষয় হইল, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ছাত্রাবাসগুলিতে অবহেলিত শ্রেণী ও জনজাতি সমাজের সন্তানরাই পড়াশোনা করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের আর এক অনন্য কীর্তি হইল তাঁহার তীর্থ সংস্কার। তিনি মনে করিতেন, তীর্থস্থানগুলিই ভারতের অখণ্ডতার সূত্রকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। তীর্থযাত্রীগণ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে তীর্থদর্শন করিতে পারেন তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তীর্থক্ষেত্রগুলিতে সর্বশ্রেণীর মানুষের অবাধ প্রবেশেরও সুব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বহুমুখী কর্মধারা আজ ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইয়াছে। সর্বত্রই তাহা হিন্দুজাতির আশা ভরসার স্থল হইয়া রহিয়াছে।

আরও উল্লেখ করিবার বিষয় হইল, সঙ্ঘগুরু স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ স্বাধীনতাপূর্ব কালে হিন্দুদিগের রাজনৈতিক জীবনে দুর্যোগের ঘনঘটা অনুভব করিয়া ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হিন্দুজাতির নেতা নির্ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই আশীর্বাদে ড. মুখোপাধ্যায় পাকিস্তানের গ্রাস হইতে বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্বরক্ষার ভূমি পশ্চিমবঙ্গ ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। গুরু মহারাজের এই দূরদর্শিতার ধারা অদ্যাবধি বহন করিয়া চলিয়াছেন সঙ্ঘের সন্ন্যাসীগণ। কোনোপ্রকার দ্বিধা না রাখিয়া তাঁহারা হিন্দুদিগের সুরক্ষা প্রদানে সদা তৎপর রহিয়াছেন। মুসলমান অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুদিগের রক্ষাকর্তারূপে স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজকে শুধু মুর্শিদাবাদ নহে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনসাধারণ হৃদয়াসনে স্থান দিয়াছে। তাঁহার অজস্র সেবাকার্য— চিকিৎসা, শিক্ষা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, সাংস্কৃতিক জাগরণ, গ্রামোন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ, জনজাতি উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, যুবসমাজের চরিত্র গঠন এবং দেশপ্রেম জাগরণের পরিচয় লাভপূর্বক কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করিতে মনস্থ করিয়াছে। সরকারের এই শুভ উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদিগের মনোবল যথেষ্ট বৃদ্ধি করিবে এবং রাজ্যে শাসকদলের মদতে জেহাদি শক্তির যে বাড়বাড়ন্ত শুরু হইয়াছে তাহার মোকাবিলা করিতেও সক্ষম হইবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

সুভাষিতম্

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভঃ তিতিক্ষা ধর্মনিত্যতা।
যমর্থান্নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্চতে।। (বিদুরনীতি)

যিনি নিজের যোগ্যতায় ভালোভাবে পরিচিত এবং সেই অনুসারে হিতকারী কাজ করে থাকেন, যাঁর দুঃখ সহ্য করার শক্তি আছে, যিনি বিপরীত পরিস্থিতিতেও ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হন না, তাঁকেই সত্যিকারের পণ্ডিত বলা হয়।

অভয়া তদন্ত আরও গতি পাবে, কারণ পদ্ধতিতে পরিণাম যথার্থ হয়

অন্তর্ধান

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

জটিল বেড়াজাল তৈরি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভ্যানিশ করে দিয়েছেন। কাছের লোক বলে বিবেচিত এক আইনজীবীকেও সরিয়েছেন। আইনি কাগজপত্র কেড়ে নিয়ে প্রবলভাবে অভিষেক বিরোধী একটি সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছেন। তৃণমূল ছেড়ে আসা এক উঠতি বিজেপি নেতা মমতা-বিরোধী নতুন দল গড়ার খবর ফাঁস করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সতর্ক হয়ে অভিষেককে সরিয়ে দেন।

অভিষেকবাবুর মদতেই নাকি ওই নতুন দল হচ্ছিল। বিজেপি অভিষেককে ভাঙিয়ে মমতার ঘর ভাঙতে চায়— এই আজব তত্ত্বটি অনেকদিন থেকেই ঘোরাফেরা করছে। এটি সেই মোদী-মমতা সেটিং তত্ত্বের মতো। নির্বাচনী অপদর্থতা ঢাকতে বিদেশি বামেরা এই অলীক সেটিং তত্ত্ব প্রচার করেছে। অভয়াকাণ্ড নিয়েও এক অদ্ভুত সেটিং তত্ত্ব চলছে।

অভয়াকাণ্ডে কলকাতা পুলিশ এক নরপশুকে গ্রেপ্তার করে। পরে আদালতের নির্দেশে তাকে হেপাজতে পায় সিবিআই। সে দোষী প্রমাণিত হয়। পরিণাম এক হলেও পদ্ধতি আলাদা। পদ্ধতি পরিণামের যথার্থতা দেয়। উলটোটা নয়। বিজেপি থেকে তাড়া খাওয়া কিছু হেরো নেতা এখন উলটো তত্ত্বটি আওড়াচ্ছেন। তৃণমূলে তারা ঠাঁই চায়। তৃণমূলের মতো ছোটো দলকে যেকোনো মাপের অপ্রাসঙ্গিক নেতা প্যাঁচে ফেলতে পারে।

মমতার আঁতুরঘর কংগ্রেস। পরিবারভিত্তিক কংগ্রেসের রাজনীতি হলো 'কানে দেখা, চোখে শোনা'। মুসলমান সম্প্রদায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুদের পূজা-পার্বণকে ধর্মের আওতার বাইরে রেখেছেন। তাকে উৎসব হিসেবে ঠাওরেছেন। যাতে সেকুলার দেশের বিদেশি তকমায় উৎসবের ওপর প্রশাসনিক বিধিনিষেধ আরোপ করা যায়। মমতা হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করায় তাঁর দুধেল গাইয়েরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতীপূজা বন্ধের হুমকি দিয়েছে। কলকাতার একটি কলেজে সশস্ত্র পুলিশি প্রহরায় সরস্বতীপূজা করতে হয়েছে। তালিবানি হিসেবে মমতার নজির কোনো ব্যতিক্রমী নয়।

প্রশাসনিক মমতা চলেন আমলাদের বুদ্ধিতে। রাজনৈতিক মমতা নিজের বুদ্ধিতে। তবে সেখানেও তিনি আমলাদের ওপর নির্ভর করেন। কোনো পেশাদারি বুদ্ধি আর দলীয় মদত নিতে তিনি গররাজি। সেখানেই অভিষেকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। উত্তরসূরী হিসেবে অভিষেককে জায়গা দিতেই হয়তো মমতা এই ফন্দি এঁটেছেন। বাকিটা নাটক। কংগ্রেসের রাজনৈতিক ঘরে জন্মগ্রহণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরিবারতন্ত্রের বাইরে যেতে পারেন না। যেমন পারেনি নেহরু পরিবার।

মমতা এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চান। কত শতাংশ হিন্দু ভোট পান তার হিসাব তৃণমূল ইচ্ছে করেই দেয় না। অথচ ৯৫ শতাংশ মুসলমান ভোটের ঢক্কানিনাদ করা হয়। মহিলা ভোটের ক্ষেত্রেও তাই। শেষ লোকসভা ভোটে ১৫টি মহিলা-অধ্যুষিত আসনের মধ্যে বিজেপি ১২টিতে জয়লাভ করে।

বাংলাদেশে হিন্দু হত্যা এবং তাদের ওপর নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটিবারের জন্য প্রতিবাদে সোচ্চার হননি। হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ খোলার পরিবর্তে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ অবলম্বন করে কেন্দ্রের দিকে বল ঠেলেছেন। মমতা ভালো করে জানেন, মোল্লাবাদীরা বাংলাদেশকে কীভাবে আবার জোর করে পরাধীন করেছে। তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যায় যে, কেন্দ্রের সঙ্গে সাযুজ্য রাখতেই মমতা বাংলাদেশ বিষয়ে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছেন। তাহলে এটা কীকরে মানা যায় যে তিনি বিএসএফের সমালোচনা করে জঙ্গি আর রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশে মদত দিচ্ছেন না? ৯৫ শতাংশ মুসলমান ভোট পাওয়ার পরও নতুন করে ওই ভোট পাওয়ার জন্য মমতা চুপ করে রয়েছেন, এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

তাহলে মমতা কী কারণে বাংলাদেশ নিয়ে মুখ খুলছেন না? অথচ সেখানকার মোল্লাবাদী আর জঙ্গিরা তাঁর মদত চাইছে। তাহলে কি মমতার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে তারা আশ্রয় বানাতে চায়? ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। খুব স্বাভাবিক যে এখন মোল্লাবাদী আর জঙ্গিরা সারা বিশ্বে কোথাও ঘর পাবে না। অভয়াকাণ্ডের পর রাজ্যে মমতাবিরোধী হাওয়া তীব্র হয়েছে। তাই হয়তো মমতা তাঁর রাজনৈতিক পরিধান ছেড়ে রাজনৈতিক ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছেন। অভয়াকাণ্ডে তথ্য লোপাটে সহায়তার পাশাপাশি আপাতত তিনি অভিষেককেও লোপাট করে দিয়েছেন। এক অধ্যাপক 'তৃণমূল নেতা মুকুল রায় ভ্যানিশ'-এর কার্টুন আঁকায় তাঁকে হয়রানি করা হয়। এখন 'অভিষেক ভ্যানিশ' কার্টুন আঁকার অনেক মানুষ তৈরি। তাই মমতা হুংকার দিচ্ছেন---'আমিই সব'। সিংহের নয়, আওয়াজটা বেড়ালের মতো শোনাচ্ছে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

এক অধ্যাপক 'তৃণমূল নেতা মুকুল রায় ভ্যানিশ'-এর কার্টুন আঁকায় তাঁকে হয়রানি করা হয়। এখন 'অভিষেক ভ্যানিশ' কার্টুন আঁকার অনেক মানুষ তৈরি। তাই মমতা হুংকার দিচ্ছেন—'আমিই সব'।

দেবী সরস্বতী এলেন, বাধাও পেলেন, জয় বাংলা

পূজাপ্রেমীষু দিদি,

সরস্বতী পূজাও শান্তিতে কাটল না পশ্চিমবঙ্গে। হিন্দুধর্মের উপরে আক্রমণে বাংলাদেশ একা নয়, দিদি, আপনার রাজ্যও এগিয়ে। বিতর্কে বাঙালির বিশেষ বুৎপত্তি। বিতর্কে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু বিতর্ক যখন পুজোয় বাধা নিয়ে, তখন দিদি সমস্যা তো হবেই। প্রশ্ন তো উঠবেই।

বসন্ত পঞ্চমীর পুণ্যতিথিতে বাগ্‌দেবীর আরাধনা নিয়েও বিতর্ক থেমে থাকেনি। বিশ ও একুশ শতকের বাঙ্গালির ইতিহাস নাড়াচাড়া করলে দেখা যাবে, সরস্বতী পূজা নিয়ে কত রকম প্রশ্ন, সংশয়, এমনকী সংঘাত উপস্থিত হয়েছে বারংবার। সেই সঙ্গে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সরস্বতীর কাহিনি নিয়ে কেচ্ছা করতেও ছাড়ে না।

কয়েক বছর আগে এই কলকাতারই দক্ষিণ প্রান্তের এক কলেজে হইচই শুরু হয়, কোনো শিক্ষায়তনে আদৌ কেন পূজা হবে, তা নিয়ে। তারপর মহানগরের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ কলেজ প্রেসিডেন্সিতেও দেখা গিয়েছিল এই একই ঘটনা। যে কোনো ধর্মাচারের ঊর্ধ্বে বিদ্যায়তনের সংস্কৃতির স্থান হওয়ার কথা, তাহলে স্কুল-কলেজে পূজা-আর্চা কেন? কিন্তু অন্য ধর্মের এমন কোনো উৎসব রয়েছে কি? এই প্রশ্নটাও ওঠে।

তবে, একথা ভাবলে ভুল হবে যে, সরস্বতী আরাধনায় বাধা এসেছে কেবল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে। একাধিক পক্ষ একাধিক ক্ষেত্রে আপত্তি তুলেছে বিভিন্ন সময়ে। ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, 'সেকুলার' ধারণার প্রবক্তারা, কিংবা অন্যান্য মতে বিশ্বাসীরাও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় সমাজে বাগ্‌দেবীর পূজার্চনাকে ঘিরে উত্তেজনার বারুদ হু-হু করে বেড়েছিল, যার একদিকে ছিল ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত একটি কলেজ, অন্যদিকে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা। কেবল তাই নয়, এই নিয়েই শেষপর্যন্ত তীব্র মতসংঘাত বেধেছিল বাঙ্গালির দুই শ্রেষ্ঠ যুগপুরুষের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুভাষচন্দ্র বসু। সিটি কলেজের রামমোহন রায় হস্টেলে সরস্বতী পূজার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিলেন কর্তৃপক্ষ। কেননা, সেটি ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত কলেজ। এদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তব্য ছিল, কলেজের কার্যক্রমে তাদেরও সমান অধিকার। সুতরাং পূজায় বাধাদান অকর্তব্য। বিষয়টি এত দূর গড়ায় যে কর্তৃপক্ষ পূজা না করতে দেওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা কলেজ ছাড়িয়ে ছেলে-মেয়েদের অন্যত্র ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেন। এক সম্পদশালী হিন্দু ব্যক্তি এই কলেজের উন্নতিকল্পে বড়ো অঙ্কের অর্থ দান করেছিলেন। এই ঘটনার অভিঘাত এতদূর গড়ায় যে তিনি সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত চান। সুদসমেত। তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র মনে করেছিলেন, পূজা হওয়াই উচিত, এই নিয়ে হিন্দু-ব্রাহ্ম সংঘাতের কোনো অর্থ থাকতে পারে না। তবে আপনার রাজত্বে দিদি বিতর্ক সেরকম নয়, সবটাই হুমকি। আর তা নিয়ে গোলমাল কম নয়। আপনি আবার তো পূজার পক্ষে। পূজা বা উৎসবপ্রেমী বললে অত্যুক্তি হবে না।

> “পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের বাড়াবাড়ি যে জায়গায় পৌঁছেছে তাতে বাংলাদেশ হয়ে উঠতে কিন্তু বেশি সময় লাগবে না। সীমান্তের গ্রামগুলিতে যেভাবে অস্ত্রের ঝংকার শোনা যাচ্ছে, যেভাবে দিন দিন সীমান্তে সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বাড়ছে তাতে অচীরে বড় বিপদ ঘটতেই পারে।”

এবার কিন্তু অন্যরকম দেখা গেল। যিনি অর্থাৎ যে যুবক প্রথমে সরস্বতী পূজা নিয়ে বাধা দেওয়ার কথা বলেন, পরে তিনিই পুষ্পাঞ্জলি দিতে বসে যান। দিদি, সেটা কি আপনার নির্দেশেই। কারণ, দিদি আপনি যতই মুসলমানদের 'দুধেল গাই' বলুন না কেন, হিন্দু ভোটও যে আপনার বড়ো প্রিয়, তা তো মানতেই হবে। তাই দুধেল গাইদের আপনি ততটাই বাড়াবাড়ি করতে দেন, যতদূর পর্যন্ত আপনার ভোট অক্ষুণ্ণ থাকে। তবে দিদি, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের বাড়াবাড়ি যে জায়গায় পৌঁছেছে তাতে বাংলাদেশ হয়ে উঠতে কিন্তু বেশি সময় লাগবে না। সীমান্তের গ্রামগুলিতে যেভাবে অস্ত্রের ঝংকার শোনা যাচ্ছে, যেভাবে দিন দিন সীমান্তে সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বাড়ছে তাতে অচিরে বড়ো বিপদ ঘটতেই পারে □

অতিথি কলম

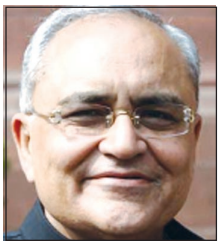

বলবীর পুঞ্জ

ভণ্ড কংগ্রেস এবং তাদের নকল বাবাসাহেব প্রীতি

ভারতের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে উঠতে থাকা বিপদের কালো মেঘকে অনেক আগেই দেখতে পেয়েছিলেন বাবাসাহেব। সেই বিপদ উপলব্ধির জন্য সম্যক রাজনৈতিক জ্ঞানগম্যি ও দূরদর্শিতা তাঁর ছিল। পরিতাপের বিষয় হলো নেহরু-সহ তাবৎ সমকালীন জাতীয় নেতৃত্বের সেহেন বোধবুদ্ধির নিতান্ত অভাব ছিল।

কংগ্রেস এবং বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের প্রভাব কি পরস্পরবিরোধী? উত্তর হলো, হ্যাঁ। যেখানে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের হাল প্রতিদিন খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে, সেই প্রেক্ষাপটে সমাজ চেতনা ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতিমূর্তি রূপে, এক ভিন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন ড. আম্বেদকর। এতকাল ড. আম্বেদকরের প্রতি কারা, কেন ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করেছে? ১৯৫৬ সালে তাঁর তিরোধানের আগে বিংশ শতাব্দীর এই মহান ভারতীয় সমাজ সংস্কারককে ভারতীয় রাজনীতিতে কে বা কারা রীতিমতো ব্রাত্য করে রেখেছিল? কিছুদিন আগেও যাদের চোখে ড. আম্বেদকর ছিলেন হাসিঠাট্টার পাত্র, যারা তাঁকে 'দেশদ্রোহী' পর্যন্ত আখ্যা দিয়েছিল, কারচুপি করে লোকসভা ভোটে তাঁকে হারিয়েছিল, দেখা যাচ্ছে যে আজ তারাই তাঁর বিচারধারা এবং রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের দাবি তুলছে।

কংগ্রেসের ভণ্ডামি ও সুবিধাবাদী রাজনীতি : ড. আম্বেদকরের আদর্শের উত্তরাধিকার আদায়ে প্রয়াসরত কংগ্রেস বিচারাধারাগত বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে প্রায় ডুবতে বসেছে। বাবাসাহেবের প্রতি নেহরুর অবহেলা ও অসম্মানের বিষয়টি গোটা বিশ্ব জানে। ১৯৫৫ সালে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নিজেই নিজেকে 'ভারতরত্ন' সম্মান প্রদানের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেননি নেহরু। কিন্তু বাবাসাহেবকে 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত করার ক্ষেত্রে ৩৫ বছর সময় লাগে। এক ঐতিহাসিক অন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে বিজেপি ও বামদলগুলি দ্বারা সমর্থিত, কংগ্রেসের বিদ্রোহী নেতা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার ১৯৯০ সালে ড. আম্বেদকরকে 'মরণোত্তর ভারতরত্ন' পুরস্কারে সম্মানিত করে। এই সময় ভারতীয় সংসদের সেন্ট্রাল হলে বা কেন্দ্রীয় সভাকক্ষে তাঁর প্রতিকৃতি স্থাপিত হয় এবং 'দ্য শিডিউলড্ কাস্ট অ্যান্ড শিডিউলড্ ট্রাইব (প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটিজ) অ্যাক্ট' বা 'তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি (অত্যাচার নিবারণ) অধিনিয়ম' আইনটি ভারতীয় সংসদে প্রণীত হয়। ড. আম্বেদকরকে নেহরু একজন খলনায়ক হিসেবে তুলে ধরেছিলেন এবং ভারতীয় জনমানসে তাঁর সুমহান ভাবমূর্তিকে ধূলিসাৎ করার লক্ষ্যে সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। আজ নিজেদের রাজনৈতিক নৌকাডুবি রুখতে এবং নির্বাচনী ভাগ্যোন্নতি ঘটাতে ড. আম্বেদকরের নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কোনোরকম কুণ্ঠাবোধ নেই। এই ব্যাপারগুলিই কংগ্রেস নেতৃত্বের ভণ্ডামি এবং তাদের চরম সুবিধাবাদী রাজনীতির লক্ষণ।

ড. আম্বেদকরের সঙ্গে কংগ্রেসের অপ্রিয় সম্পর্ক : ড. আম্বেদকরের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কটিকে স্পষ্টতই দু'টি পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়টি হলো, যখন গান্ধীজী জীবিত ছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো, ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজীর দুর্ভাগ্যজনক হত্যাকাণ্ড পরবর্তী অধ্যায়। ১৯৫০ সালের ১৫ ডিসেম্বর সর্দার প্যাটেল প্রয়াত হন। তাঁদের মৃত্যুর পর কংগ্রেসের মধ্যে অপরিমিত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন নেহরু। প্রধানমন্ত্রিত্বের শক্তিশালী পদে আসীন হওয়ার পরে ক্ষমতার রাজনীতি শুরু করেন তিনি। তার চরিত্রের যাবতীয় আবরণ খসে পড়ে উন্মোচিত হয় তার স্বৈরাচারী প্রবৃত্তি। কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে সেই সব নেতার রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দেওয়ার ওপর তিনি জোর দিলেন যারা বিচারধারাগত বিভিন্ন বিষয়ে তার সঙ্গে সহমত ছিলেন না এবং যাঁদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক শত্রুতা ছিল। নেহরু তার পূর্বপুরুষদের মতোই আধিপত্যবাদী ছিলেন। তার প্রভুত্ববাদী চিন্তাধারা জারিত দৃষ্টিভঙ্গি সেই সব বরেণ্য ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, জ্ঞান ও বৌদ্ধিক ক্ষমতাকে বার বার অসম্মানিত করে, যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে নেহরুর সঙ্গে অসম্মত হন। নেহরুর হ্যাঁ-তে হ্যাঁ না মেলানোর কারণে তাঁরা নেহরুর বিরাগভাজন হন। এর বিপ্রতীপে গান্ধীজী ছিলেন এঁদের নিয়ে চলার এবং তাঁদেরকে গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী। নেহরুর মন্ত্রীসভায় তিনজন অকংগ্রেসি নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করানোর ব্যাপারে গান্ধীজী নেহরুকে রাজি করিয়েছিলেন। এই তিনজন জাতীয় স্তরের নেতা ছিলেন ড. আম্বেদকর (মন্ত্রীসভায় শামিল হওয়ার পর তিনি সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে খসড়া সমিতির প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন), ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বলদেব সিংহ। নেহরুর পরম মিত্র ছিলেন কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লা। সেই শেখ আবদুল্লা সরকার ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে। বন্দি থাকা অবস্থায় কাশ্মীরেই ড. মুখোপাধ্যায়ের রহস্যময় মৃত্যু ঘটে। ড. আম্বেদকরকেও গ্রাস করে নেহরুর রাজনৈতিক প্রতিশোধস্পৃহার আঁচ। লোকসভা ভোটে ড. আম্বেদকর পরাজিত হন। শোনা যায় যে, নেহরুর তরফে কলকাঠি নাড়ার মাধ্যমে তাঁকে সেই নির্বাচনে হারিয়ে দেওয়া হয়। নির্বাচনী কারচুপির দ্বারা হারিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ড.

আম্বেদকরকে দিল্লির ক্ষমতাকেন্দ্র হতে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হয়।

নেহরুর প্রতিশোধস্পৃহার শিকার হন বাবাসাহেব : ১৯৫২ সালে নেহরু নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে উত্তর বম্বে (বর্তমানে উত্তর মুম্বই) আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বাবাসাহেব। কংগ্রেস একজন গোপালক (গোয়ালা) নারায়ণ কাজরোলকরকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী করে। বাবাসাহেবকে কুৎসা ও অপমান করার উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি বাবাসাহেবকে 'গদ্দার' আখ্যা দেয়। প্রায় ১৪ হাজার ভোটে এই নির্বাচনে বাবাসাহেব পরাজিত হন। ৭৮ হাজার ভোটকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির ঘটনা এর থেকেই স্পষ্ট।

ড. আম্বেদকরের হারে নেহরুর মনে আনন্দের বান ডেকে যায়। ১৯৫২ সালের ১৬ জানুয়ারি তাঁর বান্ধবী লেডি এডুইনা মাউন্টব্যাটেনকে নেহরু লেখেন যে, 'বম্বে শহরে, বিশেষত পুরো বম্বে রাজ্যজুড়ে আমাদের সাফল্য প্রত্যাশার সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। আম্বেদকরকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এর আগে ১৯৪৬ সালের ২৬ জানুয়ারি রাজকুমারী অমৃত কৌরকে লেখা চিঠিতে ঘটে বাবাসাহেবের প্রতি নেহরুর বিদ্বেষের প্রতিফলন। এই চিঠিতে নেহরু লেখেন, 'আমি এই বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছিলাম যে আম্বেদকর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিয়েছেন এবং কংগ্রেস-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এই কারণে তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনোরকম কথাবার্তা এগোনো অসম্ভব।'

ড. আম্বেদকর সম্পর্কে একদা এহেন চিন্তাভাবনা পোষণ করা নেহরু ও কংগ্রেসের এখন এমনই দশা যে বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে নিজেদের অস্তিত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ড. আম্বেদকরের আদর্শ ও তাঁর উত্তরাধিকারের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করার প্রয়াস পূর্ণ উদ্যমে চালিয়ে যাচ্ছে নেহরুর প্রপৌত্র এবং তার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস।

নেহরুর মুসলমান প্রীতি : নেহরু ও ড. আম্বেদকরের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস ছিল শূন্য। মুসলমানদের প্রতি নেহরুর পক্ষপাত ও আসক্তি এতটাই গভীর ছিল যে ভারতীয় অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ তার চোখে ছিল প্রায় অদৃশ্য। এই বিষয়টিতে বাবাসাহেব ছিলেন বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। ১৯৫১ সালের ১০ অক্টোবর ইস্তফাপ্রদানের পর বাবাসাহেব বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর পুরো সময় ও মনোযোগ মুসলমানদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সমর্পিত। আমি জানতে চাই যে কেবলমাত্র মুসলমানদেরই কি উন্নয়ন প্রয়োজন? তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং ভারতীয় খ্রিস্টানদের কি সুরক্ষা বা উন্নয়নের কোনো প্রয়োজন নেই?'

প্রশ্ন হলো, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান কংগ্রেস কি বাবাসাহেবের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীর আসন গ্রহণ করতে পারে? বাবাসাহেবের প্রতি নেহরুর ঘৃণা ও বিদ্বেষ যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যেভাবে বাবাসাহেব হয়ে উঠেছিলেন নেহরুর চোখে ঘোর অপছন্দের পাত্র এবং তার বিপ্রতীপে বাবাসাহেবের মনে নেহরুর প্রতি ছিল যে সন্দেহ ও চরম অবিশ্বাস, সেই প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করলে বাবাসাহেবের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের আসনে বর্তমান কংগ্রেসের আসীন হওয়ার বিষয়টি যেন প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। কারণ কংগ্রেস একইসঙ্গে নেহরু ও আম্বেদকরের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার দাবি করতে পারে না। তাদের রাজনৈতিক সত্তার অংশ হিসেবে নেহরু ও আম্বেদকরকে একইসঙ্গে তুলে ধরতে পারে না। হতে পারে কংগ্রেস ভাবছে যে দেশের সাধারণ মানুষের স্মৃতিশক্তি অতি দুর্বল। মানুষ হয়তো পুরনো ইতিহাস ভুলে গিয়েছে। কংগ্রেসের এই নাটক আর কতদিন চলবে? সময়ই হয়তো এর উত্তর দেবে। বাস্তবে গান্ধীজীর সঙ্গেও বাবাসাহেবের বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ ছিল। কখনও কখনও সেই মতান্তর পৌঁছে যেত চরম সীমায়। মতানৈক্য সত্ত্বেও তাঁরা দু'জনেই ছিলেন একই পথের পথিক। কারণ একটা পর্যায় পর্যন্ত তাঁদের লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। গান্ধীজীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশের পরাধীনতার কবল হতে ভারতকে মুক্ত করা এবং ভারতীয় জনতার সামাজিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা। নানা জাতপাতে বিভক্ত হিন্দুসমাজ ব্যবস্থায় অস্পৃশ্যতার মতো কুপ্রথার শিকার হওয়া মানুষদের 'হরিজন' হিসেবে পরিচয় দেন গান্ধীজী। এটি তাঁর কাছে ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। হরিজনদের বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল। অনগ্রসর সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ড. আম্বেদকর। সমাজে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর একজন হিসেবে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল অনেক জ্বালাযন্ত্রণা ও অপমান। এই কারণে অস্পৃশ্যতা দূরীভূত করে নিজ সমাজের মানুষদের জীবনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলার বিষয়টি তাঁর কাছে ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দু'জন দেশবরেণ্য নেতার লক্ষ্য ছিল একই, কিন্তু কাজের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। অনগ্রসর জাতিভুক্তদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ক্ষেত্রের সংস্থান বা তাদের জন্য আলাদাভাবে আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের লক্ষ্যে ইংরেজ সরকার একটি প্রস্তাব পেশ করলে, গান্ধীজী ও ড. আম্বেদকর— দু'জনের মধ্যে মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করে। বাবাসাহেব ব্রিটিশ প্রদত্ত এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। তিনি ভেবেছিলেন যে এই প্রস্তাব কার্যকর হলে অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণের লক্ষ্যে তার প্রভাব হবে ইতিবাচক।

১৯৩৩ সালে গান্ধীজী তাঁর সম্পাদিত 'হরিজন' পত্রিকায় ড. আম্বেদকরকে কলম ধরতে অনুরোধ করেন। তাঁর প্রতিবেদনে জাতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেন বাবাসাহেব। জাতপাতভিত্তিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে তিনি লেখেন, 'নিম্নবর্ণের মানুষ, যাঁরা জাতি-বহিষ্কৃত, জাতিভেদ ব্যবস্থারই পরিণামস্বরূপ। যতদিন এই জাতপাতভিত্তিক ব্যবস্থার প্রচলন থাকবে, ততদিন এই অচ্ছুত, জাতি-বহিষ্কৃত মানুষও থাকবে। জাতিভেদ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ছাড়া অস্পৃশ্যতার করাল গ্রাস থেকে এই মানুষগুলির মুক্তি নেই। আগামীদিনের লড়াইতে হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব, যদি এই ঘৃণ্য, হিংস্র ও জঘন্য চিন্তাধারার কবল হতে হিন্দুধর্মকে মুক্ত করা সম্ভবপর হয়।'

বাবাসাহেব সেদিন ভবিষ্যতের কোন লড়াইয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন? তাঁর ইঙ্গিত স্পষ্টতই ছিল সেই সময়ে (অর্থাৎ, ১৯৩০ পরবর্তী পর্যায়ে) হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার দিকে, যার শেষ পরিণতি রক্তাক্ত দেশ বিভাজনের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক একটি পৃথক ইসলামি দেশ সৃষ্টি, যে দেশটিতে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখেদের কোনো স্থান ছিল না। ভারতের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে উঠতে থাকা বিপদের কালো মেঘকে অনেক আগেই দেখতে পেয়েছিলেন বাবাসাহেব। সেই বিপদ উপলব্ধির জন্য সম্যক রাজনৈতিক জ্ঞানগম্যি ও দূরদর্শিতা তাঁর ছিল। পরিতাপের বিষয় হলো নেহরু-সহ তাবৎ সমকালীন জাতীয় নেতৃত্বের সেহেন বোধবুদ্ধির নিতান্ত অভাব ছিল।

(লেখক একজন বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক এবং ভারতীয় জনসঞ্চার সংস্থানের পূর্বতন অধ্যক্ষ)

অ্যারো ইন্ডিয়ায় ধামাকা ভারতের
চীন-পাকিস্তানকে টেক্কা দেওয়ার প্রস্তুতি সারা

এশিয়ার বৃহত্তম বিমান প্রদর্শনী 'অ্যারো ইন্ডিয়া ২০২৫'-এর পঞ্চদশতম সংস্করণ আগামী ১০ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হওয়ার কথা। যার প্রথম তিনদিন কার্যদিবস এবং শেষ দু'দিন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই অনুষ্ঠানে মহাকাশ খাতের বিভিন্ন সামরিক মঞ্চের আকাশ প্রদর্শন এবং স্থির প্রদর্শনী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফাইভ জি-র যুদ্ধবিমান চলতি মাসে অ্যারো ইন্ডিয়ার সময় বেঙ্গালুরুতে ইয়েলহাঙ্কা বিমানঘাঁটিতে জনতাকে তাদের প্রদর্শন দেখিয়ে মুগ্ধ করতে প্রস্তুত। ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যুদ্ধবিমান অন্তর্ভুক্তিতে বড়ো ধরনের বিলম্ব এবং উন্নয়নশীল দেশীয় ফাইভ জি-র যুদ্ধবিমানের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে তীব্র সংকটের মধ্যে ভারতীয় আকাশসীমায় তাদের সম্মিলিত উপস্থিতি এল অন্ততপক্ষে এক দশক পরে। সমর বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামীদিনে এই ঘটনা জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের প্রভাব তো ফেলবেই এবং সেই প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারীও।

দুটি সরকারি সূত্র পৃথকভাবে নিশ্চিত করেছে যে, রাশিয়ান এসইউ-৫৭ যুদ্ধবিমান এবং মার্কিন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান উভয়েরই অ্যারো ইন্ডিয়াতে অংশগ্রহণের বিষয়টি চূড়ান্ত। সূত্র মারফত এও জানা যাচ্ছে যে, রাশিয়ার ফাইভ জি-র এসইউ-৫৭, বিমানবাহিনীর স্টেশনের উপর মহড়া চালাবে এবং দুটি এফ-৩৫ স্থির প্রদর্শনে থাকবে। তাদের মহড়া চালানোর সম্ভাবনা কম। ২০২৩ সালে অ্যারো ইন্ডিয়ার শেষ সংস্করণেও দুটি এফ-৩৫ স্থির প্রদর্শনীতে ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি বি-১ দীর্ঘ পাল্লার বোমারু বিমানও আনবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা গত সংস্করণে আকাশ প্রদর্শনীর চেষ্টা করেছিল এবং তারা এফ-১৬ যুদ্ধবিমানও আনবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান সংক্রান্ত এএমসিএ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হতে কমপক্ষে আরও দশ বছর সময় লাগবে। চীনের কাছে দু'শোটি ফাইভ জি-র যুদ্ধবিমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, পাকিস্তান চীন ও তুরস্ক উভয়ের কাছ থেকে উন্নত যুদ্ধবিমান পাবে। এমতাবস্থায় ভারত যদি এগুলো তৈরি করতে না পারে, তবে আকাশসীমায় জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবেই, একইসঙ্গে আকাশপথে শক্তিপ্রদর্শনেও ভারত পিছিয়ে পড়বে। ফলে আমেরিকা বা রাশিয়ার কাছ থেকে এই ধরনের যুদ্ধবিমান কেনা ছাড়া আপাতত গতি নেই। বর্তমানে ভারত রাশিয়ার যুদ্ধবিমান নিয়ে খুব একটা আগ্রহী ছিল না। কারণ ভারত দ্বিমুখী যুদ্ধবিমান তৈরি করছে। প্রথমটি এএমসিএ এবং দ্বিতীয়টি টিইডিবিএফ। কিন্তু রাশিয়া প্রতিনিয়ত এসইউ-৫৭-এর শক্তি দেখানোর চেষ্টা করছে। কূটনীতিকরা মনে করছেন, ভারত যাতে এই যুদ্ধবিমান কেনে তার জন্য বারেবারে পরোক্ষে বার্তা দিয়ে চলছে রাশিয়া। কারণ, স্টিলথ যুদ্ধবিমান হাতেগোনা কয়েকটি দেশের কাছে রয়েছে। তার মধ্যে রাশিয়া অন্যতম। ভারতের কাছে এখনও কোনো পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান নেই। ভবিষ্যতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এএমসিএ হতে পারে ভারতের পঞ্চম বা তার বেশি প্রজন্মের স্টিলথ যুদ্ধবিমান। বর্তমানে ভারতের বায়ুসেনায় বিমানবহরের সংখ্যা কমে গিয়েছে। তাই ভারত আপাত পরিস্থিতিতে স্টিলথ যুদ্ধবিমান কিনতে পারে বলে অনুমান।

কিন্তু সূত্রের খবর, শুধুই যুদ্ধবিমান কেনা হবে না, আগামীতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের অধীনে ভারতেও উৎপাদন হবে। এতে লাভ অনেক। প্রথমত, ভারতে উৎপাদন হলে দেশে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের প্রসারও ঘটবে এবং দ্বিতীয়ত, এতে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে। অন্যদিকে, ভারতে তৈরি ফাইটার জেট বিক্রির ফলে লাভবান হবে রাশিয়াও। ভারত যদি রাশিয়ার সঙ্গে এই ফাইটার জেটের চুক্তি করে, তাহলে চীন ও পাকিস্তানের সমস্যা অনেক বেড়ে যাবে। সামরিক দিক দিয়ে ভারত যে টেক্কা দেবে তাই নয়, কূটনৈতিক দিক দিয়েও ভারত কিস্তিমাত করবে। প্রথমে দেখে নেওয়া যাক, ওই যুদ্ধবিমানের শক্তি। এসইউ-৫৭-য়ের গতি প্রতিঘণ্টায় ২৬০০ কিমি। এর ১২টি হার্ডপয়েন্টও রয়েছে, ভেতরে ৬টি এবং বাইরে ৬টি। এটিতে অনেক স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ পাল্লার এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল ও গাইডেড এরিয়াল বোমা বহন করা যেতে পারে। ইউক্রেনের উপর হাজার হাজার বোমা ও ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপে এসইউ-৫৭-এর শক্তি ইতিমধ্যে প্রমাণিত। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়া এর ব্যাপক ব্যবহার করেছে। এসইউ-৫৭-এর স্টিলথ সিস্টেম গতি না কমিয়েই কাজ করে। ফলে আকাশ-যুদ্ধে এর কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত।

তাছাড়া রাশিয়ার এই যুদ্ধবিমান একটি মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান। এর মাধ্যমে অনেক ধরনের অপারেশন করা যেতে পারে। এয়ার সুপিরিওরিটি থেকে স্ট্রাইক মিশন পর্যন্ত। সমরবিদদের পরিভাষায় এর যুদ্ধের পরিসীমা ১২৫০ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ ৬৬ হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে এসইউ-৫৭ সুপারসনিক। এই যুদ্ধবিমানটির দৈর্ঘ্য ৬৫.১১ ফুট, এর উইয়ং স্পান অর্থাৎ ডানা ৪৬.৭ ফুট চওড়া। এর উচ্চতা ১৫.১ ফুট। সুপারসনিক রেঞ্জ ১৫০০ কিমি।

একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, রাশিয়া এখনো পর্যন্ত মোট ৩২টি এসইউ-৫৭ যুদ্ধবিমান তৈরি করেছে। সামরিক পরিভাষায় যার রেঞ্জ ৩৫০০ কিমি। যদি দুটি আউটবোর্ড ফুয়েল ট্যাঙ্ক লাগানো হয়, তবে এটি ৪৫০০ কিমি পর্যন্ত যেতে পারে। এতে একটি ৩০ মিমি অটোক্যানন লাগানো আছে। এই বন্দুকটি প্রতি মিনিটে পনেরশো থেকে আঠারোশো পর্যন্ত গুলি ছুঁড়তে পারে। এই বন্দুকের রেঞ্জ ১৮০০ মিটার পর্যন্ত। এদিকে, এই চুক্তি সম্পন্ন হলে এটি রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক এবং কৌশলগত সম্পর্কের শক্তিও প্রকাশ করবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যেটি ভারতের ভবিষ্যৎ যুদ্ধবিমান নিয়ে নতুন ধারণাও নিয়ে আসবে। যদি ভারতে এই যুদ্ধবিমানের একটি লাইভ ডেমো সম্পন্ন হয়, তাহলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ, প্রতিরক্ষা আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়াররা বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। যেটি প্রত্যক্ষভাবে ভারতের যুদ্ধবিমান শিল্পকে উৎসাহিত করতে পারে। আপাতত সকলের নজর ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকে।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তর্ভুক্তি ও বিতর্ক

ধর্মানন্দ দেব

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা দেশের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মৌলিক ধারণাকে তুলে ধরে। এটি কেবল সংবিধানের মুখবন্ধ নয়, বরং ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারার দিকনির্দেশ। প্রস্তাবনার প্রতিটি শব্দ দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তির প্রতীক। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা নিয়ে বিতর্কের প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য প্রস্তাবনা রচনার ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা জরুরি।

সাধারণ ধারণা অনুযায়ী সংবিধান প্রণেতা ছিলেন ড. বিআর আম্বেদকর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সংবিধান রচনার জন্য গঠিত খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ৪ নভেম্বর থেকে ১৯৪৯ সালের ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত সংবিধানের খসড়া নিয়ে গণপরিষদে ব্যাপক বিতর্ক ও সংশোধনের পর সংবিধান চূড়ান্ত করা হয়। সংবিধান রচনার পেছনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্যার বেনেগাল নরসিংহ রাওয়ের নাম। তিনি পরামর্শদাতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ সালে সংবিধানে হস্তাক্ষর করার আগে বক্তৃতায় রাওয়ের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং তাঁকে সংবিধান রচনায় অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানান।

সংবিধানের প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ তৈরি করতেই তৎকালীন সভা প্রচুর সময় ব্যয় করে। ১৯৪৭ সালের ৩০ মে প্রস্তাবনার প্রথম খসড়া পেশ করেন স্যার বেনেগাল নরসিংহ রাও। প্রস্তাবনার বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করার আগে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংবিধান কমিটির চেয়ারম্যান ড. আম্বেদকর গভীর বিশ্লেষণ করেন। অবশেষে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান কার্যকর হয়, যেখানে প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল— 'We, the People of India, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens...' ক'দিন আগেই দেশজুড়ে আমরা পালন করেছি ৭৬তম সাধারণতন্ত্র দিবস। ২৬ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে রাজধানীর কর্তব্যপথে শুরু হয় সাধারণতন্ত্র দিবসের বিশেষ প্যারেড। এবারের প্যারেডের থিম ছিল 'স্বর্ণিম ভারত : ঐতিহ্য ও বিকাশ।' প্রতিবারের মতোই যেখানে অংশ নিয়েছিল স্থল, জল, বায়ুসেনা এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা। পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনটি পালন করে গোটা ভারত। যদিও তফাত রয়েছে স্বাধীনতা দিবস ও সাধারণতন্ত্র দিবসের পতাকা উত্তোলনের ধরনে। স্বাধীনতা দিবসে দণ্ডের নীচে পতাকা বাঁধা থাকে, সেটি টেনে দণ্ডের একেবারে উপরে তোলা হয়। সাধারণতন্ত্র দিবসে পতাকা উত্তোলন করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সাধারণতন্ত্র দিবসে আগে থেকেই পতাকাটি বাঁধা থাকে দণ্ডের উপরে। সেখানেই বাঁধন খুলে উড়িয়ে দেওয়া হয় জাতীয় পতাকা। স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন করেন দেশের রাষ্ট্রপতি। স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি। ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলন করে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো 'সাইনবোর্ড' দরকার হয় না। ভারতের মতো দেশে এই কারণে সাইনবোর্ড দরকার কারণ আমরা অনেকেই মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করি (Pseudo-secularism)। তাই স্বাধীনতা লাভের এত বছর পরেও ধর্মনিরপেক্ষতাকে তুলে নেওয়ার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়।

১৯৫০ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দুটি ছিল না। ১৯৭৫-'৭৭ সালের জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সরকার সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দুটি যুক্ত করে। সমালোচকরা দাবি করেন যে, সংবিধান প্রণেতারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই শব্দ দুটি এড়িয়ে গিয়েছিলেন, কারণ সংবিধানের মূল চেতনায় ইতোমধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছিল। সংবিধানের প্রস্তাবনার মূল চেতনা ও পরিবর্তনের পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তি থাকলেও, এটি ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর অপরিহার্য অংশ হিসেবে রয়ে গেছে।

প্রস্তাবনায় এই পরিবর্তন নিয়ে আইনি চ্যালেঞ্জ করা হয়। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী, সমাজকর্মী বলরাম সিংহ এবং আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। তাঁরা দাবি করেন যে, ৪২তম সংশোধনী সংবিধানের মূল চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মামলায় সংবিধান সভার আলোচনার দলিল উপস্থাপন করে বলা হয় যে, সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা সংসদের হাতে রয়েছে, তবে সেই সংশোধন অবশ্যই সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী হতে পারবে না। আদালত উল্লেখ করে যে, 'সমাজতান্ত্রিক' ও

ফঃ ২

'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দুটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৯৯৪ সালের এসআর বোম্মাই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করে যে ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানের মূল কাঠামোর অংশ। এই রায়ের ভিত্তিতে আদালত জানায় যে, সংবিধানের প্রস্তাবনায় থাকা এই শব্দগুলো ভারতীয় রাষ্ট্রের পরিচয় ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে। 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি ভারতীয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ন্যায়ের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার প্রতিশ্রুতি দেয়। অপরদিকে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি দেশের নিরপেক্ষ অবস্থানকে নিশ্চিত করে, যেখানে সব ধর্মের প্রতি সমান আচরণ করা হয়। তবে বাস্তবে, এই দুই নীতির প্রয়োগ নিয়ে বিতর্ক রয়ে গেছে আজও। অনেকে মনে করেন যে, 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি যুক্ত করে একটি বিশেষ মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি প্রায়ই রাজনৈতিক কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয়, ১৯৭৬ সালের আগে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ ছিল না। কিন্তু সেকুলার বিশ্বে তখন 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির প্রচলন ছিল, বিশেষত ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ লেখক জর্জ জ্যাকব হোলিওক প্রথম ইংরেজিতে সেক্যুলারিজম (প্রকৃত অর্থ-ধর্মহীনতা) শব্দটি ব্যবহার করেন। তাহলে কেন ১৯৭৬ সালের আগে ভারতের সংবিধানে এই শব্দ দুটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি? এমনকী জম্মু-কাশ্মীরের আলাদা সংবিধানে (বর্তমানে বিলুপ্ত) কেন এই শব্দ দুটি ছিল না? ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তখন সংসদে নেহরুকে প্রশ্ন করেছিলেন— 'আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, শেখ আবদুল্লা কি ভারতের সংবিধান রচনার সময় ছিলেন না? তিনি কি এই সংবিধানকে তখন স্বীকার করেননি?' যদি দেশের অন্য সব রাজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের এই সংবিধান ঠিকঠাক হয়, তবে কাশ্মীরের ক্ষেত্রে তখন এটা ঠিকঠাক ছিল না কেন? কিন্তু নেহরু সংসদে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। আজকের সমালোচকরা কেন এই বিষয়ে নীরব? তাদের এই মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা আজ সকলের সামনে দিনের মতো পরিষ্কার। জম্মু-কাশ্মীরের সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটি অনুপস্থিত থাকলেও, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি তখন। তথাকথিত সমালোচকরাও তখন নীরব ছিলেন।

সংবিধানের প্রস্তাবনা আমাদের দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ। এটি কেবল একটি মুখবন্ধ নয়, বরং ভারতের সার্বভৌমত্ব গণতন্ত্রের মূল চেতনার প্রতিফলন বলা যায়। 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দদুটির অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এগুলি আমাদের দেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আরও স্পষ্ট করেছে। সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়েও এটি প্রতিপন্ন হয়েছে যে এই শব্দগুলো সংবিধানের মূল কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই শব্দগুলো আমাদের সামাজিক ন্যায়ের অঙ্গীকার এবং পন্থনিরপেক্ষতার মর্মবস্তুকে তুলে ধরে।

স্মরণ রাখতে হবে, ভারত ছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশেই সংবিধানের মুখবন্ধে 'সেকুলার' কথাটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ভারতের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে এই শব্দবন্ধ প্রথম জোড়া হয় শেখ মুজিবের আমলে। তারপর সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার স্বামী জেনারেল জিয়াউর রহমান। ক্ষমতায় এসেই ১৯৭৭ সালে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর আঘাত নামিয়ে আনেন তিনি। পরবর্তীকালে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হয় ইসলাম। ২০১০ সালে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট ১৯৭৭ সালের ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ মুছে দেওয়ার বিরুদ্ধে রায় দেয়। এরপরই হাসিনা সরকার ২০১১ সালে সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে ফের ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনে।

সম্প্রতি হাসিনা সরকারের পতনের পরই ফের ওই ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার। হাইকোর্ট সংবিধান সংক্রান্ত মামলায় অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি বাদ দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি হাই কোর্টে পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী বাতিলের পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান জনগোষ্ঠীর। এহেন বাস্তবতায় সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটির আর প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে, ১৯৭২ সালের সংবিধানে থাকা আল্লার প্রতি অবিচল আস্থার বিষয়টি পুনর্বহাল করা উচিত। এটি যেভাবে আগে ছিল, সেভাবেই তারা এখন চান। তিনি যুক্তি দেন, ২০১১ সালে শেখ হাসিনার সরকারের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলি পুনর্বহাল করা হলেও তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অপ্রাসঙ্গিক।

অন্যদিকে পাকিস্তানের সংবিধানের দিকে তাকালে দেখা যাবে 'সেকুলার' শব্দটি আদৌ নেই। পাকিস্তানের ইতিহাসের অর্ধেকই কেটেছে সেনা শাসনে, যা দেশটির গভীর জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন। ফৌজি নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ পাকিস্তানের প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তরাত্মা হিসেবে কাজ করেছে, যা সহজে পরিবর্তনযোগ্য নয়। পাকিস্তানের সংবিধান কার্যকর হয় ১৯৭৩ সালে, যা ভারতের সংবিধানের চেয়ে ২৩ বছর পিছিয়ে। অথচ ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার পরের বছরই পাকিস্তান গঠন করে তাদের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। এটি ভারতীয় এজেন্সি সিবিআই (১৯৬৩) কিংবা 'র' (১৯৬৮)-এর অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি স্পষ্ট করে যে পাকিস্তানের অগ্রাধিকার হলো গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও সামরিক শক্তি সংহত করা, যা তাদের কাছে গণতান্ত্রিক কাঠামোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি দেশেই সরকার পরিচালনায় মজহবি ও সামরিক প্রভাবের আধিপত্য রয়েছে, যা তাদের সংবিধানের ভাষা ও মূল নীতিমালায় প্রতিফলিত।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো 'সাইনবোর্ড' দরকার হয় না। ভারতের মতো দেশে এই কারণে সাইনবোর্ড দরকার কারণ আমরা অনেকেই মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করি (Pseudo-secularism)। তাই স্বাধীনতা লাভের এত বছর পরেও প্রস্তাবনা হতে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি বিয়োজনের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। ভারতের আইনপ্রণেতারা ভোটব্যাংক রাজনীতির জন্য রিস্ক নিতে চান না, যা নীতিসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করে। ভবিষ্যতে সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে আমাদের সংসদরা সংবিধান সংশোধনীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন কি না, এটাই এখন দেখার বিষয়। নেওয়া হলে তা হবে Pseudo secularist-দের চরম শিক্ষা।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

হিন্দুবিদ্বেষী বিকাশ-খাড়গেরা যেন শ্রীচৈতন্য যুগের জগাই-মাধাই

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

গত ১৩ জানুয়ারি থেকে প্রয়াগরাজে শুরু হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় মহামিলন মহাকুম্ভমেলা। এখনও পর্যন্ত প্রায় কুড়ি কোটি মানুষ গঙ্গায় ডুব দিয়েছেন। প্রশাসন মনে করছে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা এই কুম্ভে সব মিলিয়ে প্রায় ৪৫ কোটি মানুষ এখানে স্নান করবেন। এই পূর্ণমহাকুম্ভ কেবল গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমই নয়, যোগী আদিত্যনাথের ব্যবস্থাপনায় কুম্ভমেলা আজ হিন্দুধর্মের সব মত-পথের মহামিলনের মহাসঙ্গম। কিন্তু হিন্দুর এই মহামিলন সহ্য হচ্ছে না এই দেশের বাম-কংগ্রেস জুটির। কদিন আগে কুম্ভমেলার একটি ছোট্ট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর আমাদের রাজ্যের মহাবোদ্ধা সিপিএম নেতা বিকাশবাবু প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'মহাকুম্ভমেলায় মহা অগ্নিকাণ্ড। এর জন্য কি মহাপাতকেরা দায়ী? যে জলে ডুব দিলে সব পাপ মুছে যায়, তেমন একটা মহাপুণ্যস্থানে আগুন কি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অবদান? হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে যারা একটি অন্ধসংস্কারকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তারা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাবলে অগ্নিদেবকে শান্ত রাখতে পারলেন না কেন?'

—সাবাস, বিকাশবাবু সাবাস। বাপের ব্যাটা বটে আপনি! ৮০ শতাংশ হিন্দুর দেশে হিন্দুদের মহাকুম্ভমেলাকে অন্ধ-কুসংস্কার বলে কী মোক্ষম প্রশ্নটাই না করেছেন? আপনার সাহস আছে বটে। তবে বলেছিলাম কী বিকাশবাবু, আপনিতো হিন্দু দেবদেবীর ক্ষমতাহীনতা নিয়ে এত জ্ঞান দিলেন, আপনার বাপ দাদা চৌদ্দপুরুষের দেওয়া বিরাট জ্ঞানের পরিধি প্রকাশ করলেন। বলছিলাম প্রতি বছরই তো নিয়ম করে মক্কায় হজের সময় ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে হাজার হাজার হজযাত্রী আহত বা নিহত হয়। বাপের ব্যাটার মতো হবে তা নিয়ে এরকম একটা স্টেটমেন্ট? একবার বলে দেখুন তো— হজ একটা অন্ধসংস্কার। বলতে পারবেন? না পারবেন না। কারণ কমিউনিস্টরা জানে, হিন্দুদের

> "আপনারা এদেশে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্মের ধ্বংস চান। আপনারাই ক'দিন আগে সনাতন ধর্মকে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, এইডসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।"

ধর্মবিশ্বাস নিয়ে নোংরা প্রশ্ন সহজে তোলা যায়, এতে প্রাণহানির কোনো ভয় থাকে না।

কিন্তু মক্কা-মদিনা বা জেরুজালেম- ভ্যাটিকানের আস্থা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা মোটেই নিরাপদ নয়। ইসলাম সম্পর্কে এরকম কিছু বললে আপনার সেকুলার ভাইয়েরা আপনাদের মার্কস, লেনিন, কমিউনিজম, সেকুলারিজম সবার পিণ্ডি একসঙ্গে চটকে ঘণ্ট রেঁধে দেবে। আর বলছি কী, ধর্ম যখন মানেন-ই না, ভট্টাচার্য উপাধিটা ছেড়ে কোনো এক ইসলামি পদবি নিয়ে দেখান দেখি, তবে বুঝব আপনি বাপের ব্যাটা! সে গুড়ে বালি। নিজেও জানেন মহম্মদ বা সুলতান হয়ে 'ধর্ম আফিমের নেশা' বললে চামড়া গুটিয়ে দেবে। জানি, আপনার যত পাকামি নামের পাশে এই হিন্দু পদবিটা আছে বলে।

অবশ্য বিকাশবাবুর হিন্দুধর্ম অপমান এই প্রথম নয়। ক'বছর আগে তিনি প্রকাশ্য রাস্তায় নিষিদ্ধ মাংস খেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও 'কুলীন-বামপন্থী' হওয়ার পরিচয় দিয়েছিলেন। আসলে কেবল ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মালেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। রাক্ষসরাজ রাবণ তার প্রমাণ। বিশ্বশ্রবা ঋষির পুত্র হয়েও তিনি নিজের অপকর্মদোষে হয়ে উঠেছিলেন রাক্ষস। এ যুগের এই রাক্ষস-সুলভ ব্রাহ্মণ সন্তানদের দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, দেশে কি রাবণ যুগ ফিরে এল?

না, শুধু এই নরাধম একাই যে এ বিষয়ে চ্যাম্পিয়ান তা নয়। গত দু'দিন আগে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এর থেকে দশ কদমে এগিয়ে একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, 'মহাকুম্ভে গঙ্গায় ডুব দিলে কি এদেশের গরিবি দূর হয়ে যাবে? দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে? অভুক্ত শিশুদের পেট ভরে যাবে? শ্রমিকের রোজগার বেড়ে যাবে? হাজার হাজার টাকা খরচ করে যেভাবে গঙ্গায় ডুব মারার কম্পিটিশন চলছে তাতে কি দেশের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে?' ভাবুন, হিন্দুদের ভোটে জেতা নেতা হিন্দুধর্মকে কতটা ঘৃণা করলে এমন প্রশ্ন করা যায়! ভারতের সবচেয়ে বড়ো বিরোধীদল এই মহাকুম্ভ ও হিন্দুর আস্থাকে কী

অবলীলায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারে! এই খাড়গের কি সাহস আছে, লক্ষ টাকা খরচ করে যারা মক্কায় যায় তাদেরকে প্রশ্ন করার যে হজে গেলে কী গরিবি দূর হয়? খ্রিস্টানরা প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে ২৫ ডিসেম্বর যে কার্নিভাল আয়োজন করে, এই খাড়গের কি সাহস আছে তাদের প্রশ্ন করার যে এতে দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হচ্ছে কিনা? রাহুল গান্ধী ইতালিতে গিয়ে সুইমিংপুলে ডুব লাগালে, খাড়গে মাথায় ফেজ টুপি পড়ে মসজিদে মসজিদে মাথা ঠোকালে, প্রিয়াঙ্কা চার্চে গিয়ে প্রেয়ার করলে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু কুম্ভমেলার মতো হিন্দুদের মহাপর্বের বিষয়ে এমন উপহাস করার অধিকার তাঁকে কে দিয়েছে? তাদের মতে কুম্ভে স্নান করলে গরিব দূর হয়ে যায় না, কিন্তু হজে সাবসিডি দিলে দারিদ্র্য দূর হয়ে যায়, মক্কার জমজমের জল গায়ে ছিটালে শ্রমিকরা লক্ষ টাকার মাইনে পেয়ে যায় তাই না?

অর্ধশিক্ষিত বিকাশবাবু আর হিন্দুধর্ম বিরোধী খাড়গেরা শুনে রাখুন, মহাকুম্ভ হাজার হাজার বছর ধরে এদেশের সনাতনীদের আস্থার প্রতীক। কেবলমাত্র এই কুম্ভে আড়াই লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে— এর সিংহভাগই পৌঁছেছে গরিব শ্রমিক মজদুরের হাতে। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড নিউজ বলেছে, এই বছর কেবল কুম্ভমেলার কারণে ভারতের জিডিপি ১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে— এ কি এদেশের অর্থনীতিকে মজবুত করা নয়? মহাকুম্ভের কারণে এই বছর ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের ভিসা ৯১.৪ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে--- একি এদেশের অর্থনীতির উন্নতি নয়? এর ফল কি এই দেশের গরিব খেটে খাওয়া মানুষ পাবে না? এই অর্ধশিক্ষিত নেতাদের অবগতির জন্য আরও জানাই— এই বছর পৃথিবীর বৃহত্তম মোবাইল কোম্পানি 'অ্যাপল্' চীন থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ভারতে তার ব্যবসা শুরু করেছে। অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জোবসের পত্নী লরিন পাওয়েল এই মহাকুম্ভে এসে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। নিজের নাম রেখেছেন কমলা। এটা মোটেই সহ্য হচ্ছে না আপনাদের!

আসলে আপনারা এদেশে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্মের ধ্বংস চান। আপনারাই ক'দিন আগে সনাতন ধর্মকে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, এইডসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আপনাদের ইন্ডিজোটের নেতা উদয়নিধি তো হিন্দু ধর্মের সমূলনাশ চেয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। আপনাদের টার্গেট — হিন্দু জাতিকে ধ্বংস করা, সনাতনধর্মকে নির্মূল করা। জাতিগত জনগণনার নামে হিন্দুদের জাতপাতে ভেঙে টুকরো টুকরো করে এদেশে পুনরায় ইসলামি শাসন ফিরিয়ে আনা।

এবারের মহাকুম্ভমেলা দেখে আপনাদের মনে ভয় ঢুকেছে। কুম্ভের এই মহামিলনে কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করেনি কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র, কে হরিজন, কে চামার, কে উঁচু, কে নীচু, কে ধনী, কে দরিদ্র। ত্রিবেণী সঙ্গমে এসে সবাই মিলেমিশে একাকার। এই মহাকুম্ভমেলা যেন কবিগুরুর স্বপ্নের 'মহামানবের সাগর তীর'-এ পরিণত হয়েছে। কোটি কোটি হিন্দু যেখানে এসে একাত্মতার মন্ত্রে একাকার হয়ে গেছে, এটাই আপনাদের গাত্রদাহের আসল কারণ।

আপনাদের আর এক স্যাঙাত অখিলেশ যাদব, যিনি এতদিন মহাকুম্ভমেলায় যাওয়ার বিরোধিতা করছিলেন তিনিও মহাকুম্ভে হিন্দুর একতা দেখে ভয় পেয়েছেন। তাই গত ২৬ জানুয়ারি দৌড়ে গেছেন প্রয়াগরাজ। দু' তিনটি নয়, এই কনকনে ঠাণ্ডায় গুনে গুনে ১১টি ডুব লাগিয়েছেন সঙ্গমে। বুঝে গেছেন শুধু জাতপাতের বিভাজন দিয়ে হবে না। সমগ্র হিন্দু সমাজের মহামিলনক্ষেত্র মহাকুম্ভকে অপমান করে ভুল করেছেন। এতে তার জাতপাতের রাজনীতি আরও মুখ থুবড়ে পড়বে। তাই হিন্দু বিদ্বেষী অখিলেশের গুনে গুনে ১১ ডুব। এ যেন— 'ডুব ডুব ডুব ডুব সাগরে আমার মন'। এ দেখে ভারতবাসীর কি মন ভরে গেছে? শুধু তাদের আর একটা জিনিস দেখা বাকি। শ্রীচৈতন্যদেবকে কলসীর কানা মেরে রক্তাক্ত করে ছিল জগাই-মাধাই। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারাই মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ২৬ ফেব্রুয়ারি কুম্ভমেলা শেষ হতে হতে বিকাশ, খাড়গেরা শেষপর্যন্ত জগাই-মাধাইয়ের মতো পরিবর্তিত হন কিনা, কুম্ভমেলাকে গালাগালি দিতে দিতে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে করতে শেষ পর্যন্ত কুম্ভের ত্রিবেণীতে গিয়ে অখিলেশের মতো ডুবকি লাগান কিনা সেটাই দেখার। □

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

বাংলাদেশ ইসলামীকরণের দিকে যাচ্ছে, পাকিস্তানের থেকেও দ্রুততর বেগে

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

বাংলাদেশে চলছে হিন্দুদের উপর মুসমলমানদের নৃশংস, অমানবিক অত্যাচার। কী হচ্ছে না! আক্রমণ, হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং মহিলাদের উপর অমানবিক নির্যাতন, ভয়াবহ ব্যাপার। বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। আত্মরক্ষার্থে বাংলাদেশের অসহায় হিন্দুরা যখন গণতান্ত্রিক পথে তাদের প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে তখনই তাদের কণ্ঠরুদ্ধ করতে অন্যায় ও অত্যাচারের এক নতুন পর্যায় ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস এইরকম একটি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাকে আটক করে তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা শুরু হয়েছে। তার পক্ষে যাতে কোনো হিন্দু উকিল দাঁড়াতে না পারে, তাই তাদের বিরুদ্ধেও অপরাধমূলক মামলা আনা হয়েছে। এই নৃশংসতা ভাবা যায় না।

এই ইসলামিক গাজোয়ারি খুব পরিকল্পনামাফিক করা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। গোড়ায় আন্দোলনকে নিরীহ চেহারা দিয়ে শুরু করা হয়েছিল বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য, যার আড়ালে ছিল হিংস্র ইসলামবাদী চরমপন্থী মুখ। কীভাবে এটা ঘটানো হলো সেই ক্রমিক ধারাবাহিক পর্যায়গুলো আলোচনা করা যাক।

প্রথমে দেখানো হলো নিরীহ ছাত্র আন্দোলন হচ্ছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন যার কোনো ভিত্তিই ছিল না, কারণ সরকার তা বাতিল করেছিল। বরং ৫ জুন ২০২৪ বাংলাদেশ হাইকোর্ট কোটা পুনর্বহাল করে, মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য সিভিল সার্ভিসের ৩০ শতাংশ পদ সংরক্ষণ করে। পরদিন ৬ জুন জামায়াত-ই-ইসলামির ছাত্র শাখা পুলিশ স্টেশন, রাস্তা এবং প্রয়োজনীয় স্থান অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। ঢাকার জগন্নাথ, শেরেবাংলা কৃষি, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ হয়। এই ঘটনার সুযোগ নেয় চীন ও পাকিস্তান। কট্টর জেহাদিরা ভারতবিরোধী অ্যাজেন্ডা প্রচার এবং হিন্দুবিরোধী পরিবেশ তৈরি করতে থাকে। সেটা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে পরিণত হয় এবং তাঁকে প্রাণে বাঁচাতে সেনাকর্তারা হাসিনাকে একবস্ত্রে নিরাপত্তার জন্য ভারতের আশ্রয়ে পাঠায়। এরপর থেকে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চলতে থাকে। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে হাসিনা সরকার গিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে সেই মামলার রায়দান অপেক্ষিত ছিল। আসলে এসবই ছিল মুখোশ। আর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান তোষণে সদা তৎপর বঙ্গীয় বামাচারীরা তাদের সমর্থনে কলকাতায় বিক্ষোভ আন্দোলন করল।

তিনটে গোষ্ঠী ক্ষমতার শূন্যস্থানের নিয়ন্ত্রণ নিল। বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি— এরা ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলো চালায় এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশে। এরপর জামাত-ই-ইসলামি। আমলারা আছে এদের মধ্যে। এরা কট্টর ইসলামি কর্মসূচি রূপায়ণে অঙ্গীকারবদ্ধ। তৃতীয় হলো হিজবুত তাহরির, একটা উগ্র সংগঠন, তারা ওকালতি করে খলিফাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এবং সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে লিপ্ত। সামরিক বাহিনীর মধ্যে এদের প্রভাব আছে। এসব ঘটনা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার পক্ষে বিশেষত ভারতের জন্য বিপদস্বরূপ।

বাম-উদারপন্থী বা লেফট-লিবারেল বাস্তুতন্ত্র সক্রিয়ভাবে এই তিন গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা করছে এবং এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই অবৈধ অভ্যুত্থানকে যুক্তিপূর্ণ ও বৈধ করার জন্য একযোগে কাজ করছে।

শেখ হাসিনার তথাকথিত পদত্যাগের পরে গণ্ডগোল আরম্ভ হলো এবং একাধিক কারাগার ভেঙে লোক ঢুকে পড়ল। প্রতিবাদী সেজে

কিছু লোক সন্ত্রাসবাদী-সহ ১৫০০ বন্দিকে মুক্ত করে দিল। ২০২৪-এর ৯ আগস্ট বাংলাদেশের হিন্দুরা প্রতিবাদে সমবেত হলো। তারা হিন্দু-সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল।

গোপালগঞ্জ এলাকায় হিন্দুরা সরকার-বিরোধী প্রতিবাদে গর্জে উঠল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে সেনাবাহিনী তাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে হানাদারি শুরু করল; আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল।

এই ঘটনার পরে ২০১ জন নতুন যুগ্ম-সচিব এবং কয়েকজন অতিরিক্ত সচিবকে নিযুক্ত করা হলো। হিজাব-উত্-তাহরির তাদের কাজে লাগিয়ে অপব্যবহার করছে। ২৬ আগস্ট ২০২৪-এ আল কায়দা অনুপ্রাণিত চরমপন্থী আনসারুল্লা বাংলা টিমের প্রধান মুফতি জসিমুদ্দিনকে জামিন দেওয়া হলো। সে একজন উগ্র জেহাদি। ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ মহম্মদ ইউনুসকে ৯২ জন নোবেল পুরস্কার বিজেতা এবং ১৯৭ জন বিশ্ব নেতা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানাল।

বাংলাদেশে প্রায় ১ লক্ষ অস্ত্র লুট করা হয়েছে এবং এটা ওই দেশের ও পার্শ্ববর্তী ভারতের জন্য আইনশৃঙ্খলার বিপর্যয় ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। তাজুল ইসলামকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মুখ্য প্রসিকিউটর নিয়োগ করা হয়েছে যারা রাজনৈতিক বন্দিদের বিরুদ্ধে মামলার দেখাশোনা করবে। বাংলাদেশ রেডিয়ো উর্দুতে কর্মসূচি প্রচার করা আরম্ভ করেছে যাতে পাকিস্তানের উসকানি আছে।

চীন বাংলাদেশে বৃহদাকারের বিনিয়োগ শুরু করেছে। এতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব ও ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুতর পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলে। সাম্প্রতিক অবৈধ অভ্যুত্থানের পরেপরেই এই আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে যে বাংলাদেশ ক্রমশ পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

বাংলাদেশের হিন্দুরা সাধারণত শিক্ষকতা, কৃষি ও ছোটো ব্যবসায়ের মতো পেশায় জড়িত থাকে। দেশের সমাজ-অর্থনীতিতে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে অবদান আছে। কিন্তু বাংলাদেশে জেহাদি অভ্যুত্থানের পর থেকে হিন্দুদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমছে। এই ভয়াবহ প্রবণতার জন্য তাদের সুরক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হিন্দু রাজনীতিবিদরা লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার হিন্দু গ্রাম ও শহরের উপান্তে বাস করছে। হিন্দু নেতা ও পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ভুয়ো অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে, মিথ্যে খুনের অভিযোগও আনা হচ্ছে। এতে তাদের অবস্থা আরও করুণ করে তুলছে।

১৫০০ জন হিন্দু শিক্ষককে জোর করে পদত্যাগ করিয়েছে এবং সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর হিন্দু কর্মচারীদের সময়ের আগেই অবসর নেওয়া করিয়েছে। পরিকল্পনামাফিক উপায়ে জনজীবনে তাদের গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বরিষ্ঠ সাংবাদিক গৌরবকুমারের মতো অনেক হিন্দু সাংবাদিককে নিশানা করা হয়েছে। অনেককে বন্দি বা হত্যা করা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের হয়রানি খুব গুরুতর সমস্যার আকার নিয়েছে, তাতে কারণ তাদের নিরাপত্তা ও জীবিকা ব্যাহত হচ্ছে।

দুর্গাপূজার মতো বিভিন্ন মণ্ডপে সহিংস আক্রমণ করে পণ্ড করা হয়, তার মধ্যে পাথরবাজিও থাকে। এইসব ধর্মীয় উদ্‌যাপনের সময়ে ক্রমবর্ধমান হারে জেহাদি কার্যকলাপ হিন্দুদের মনে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়ে দেয়। অনেক সংবাদপত্রে ইঙ্গিত করছে যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হিংসার ৫৯ শতাংশ মন্দিরের বিরুদ্ধে ঘটানো হয়, হিন্দুদের উপাসনাস্থল ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। হিন্দু নারী ও বালিকাদের হয়রানি করে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। বালিকাদের অপহরণ নিত্য ঘটনা। এই কুকর্মগুলি বৌদ্ধদের মতো অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপরও করা হয়। এটা জাতিগত নির্মূলীকরণ প্রচেষ্টার দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করে।

বাংলাদেশে বহু উগ্রপন্থী গোষ্ঠী ভারতকে ভাঙার লক্ষ্য নিয়ে সক্রিয়ভাবে মিথ্যা আখ্যান প্রচারে তৎপর। তাদের কৌশল হলো কথায় কথায় ভারতের 'চিকেন নেক'-এর উপর আক্রমণের ভয় দেখানো, অবশিষ্ট ভারত থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার অভিপ্রায়ে। অনেক উগ্রপন্থী গল্প বিস্তারিতভাবে ছড়ানো হচ্ছে সমাজ মাধ্যমে। খবর মিলেছে এইসব উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকটা কুকি জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তাদের উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে পাঠিয়ে সেখানে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার সৃষ্টি করার লক্ষ্যে।

মহম্মদ ইউনুস এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে এই দুই দেশ ভারত-বিরোধী কোনো বৃহত্তর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে চলেছে। ১১ নভেম্বর, ২০২৪, ১৯৭১ সালের পর এই প্রথম কোনো পণ্যবাহী জাহাজ সোজাসুজি পাকিস্তান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছল। বাংলাদেশ পাকিস্তানি পণ্যের উপর আমদানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, পাকিস্তান থেকে আসা পণ্যের উপর থেকে অত্যাবশ্যকীয় পরিদর্শন তুলে দেওয়া হয়েছে, যাতে আগে যথেষ্ট দেরি হতো। ভারতের কৌশলগত স্বার্থকে উপেক্ষা করে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে জোট ক্রমশ মজবুত হচ্ছে।

পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাংলাদেশে উর্দু শিক্ষণ জোরদার করতে সম্প্রতি এক স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেছে। পাকিস্তানের হাই কমিশন এই সব ধরনের উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে তৎপর। এর ফলে এই অঞ্চলের শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষণীয় প্রভাব পড়বে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনা চলছে একটা পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর করার, তার সঙ্গে আছে সামরিক প্রশিক্ষণও। এইসব চালাচ্ছে বাংলাদেশের ভিতরের পাকিস্তান-লবি। এদের অস্তিত্ব আছে ১৯৭০-এর দশক থেকে।

বাংলাদেশের কিছু জেহাদি গোষ্ঠী ভারতের বিরুদ্ধে ঘৃণাপূর্ণ গল্প ছড়াচ্ছে। তারা ভারতের পতাকা পায়ের তলায় মাড়াচ্ছে। ভারতবিরোধী মানসিকতা এতে স্পষ্ট। এইসব আখ্যান ও কর্মতৎপরতা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতি এক তাৎপর্যপূর্ণ হুমকি। বাংলাদেশের পাকিস্তান-পন্থী উপদল ও উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির মিলিত প্রচেষ্টা ভারতের সামনে এক মস্ত বড়ো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় যা কোনোভাবেই উপেক্ষা করা উচিত নয়। বাংলাদেশ ইসলামীকরণের দিকে যাচ্ছে, পাকিস্তানের থেকেও দ্রুততর বেগে। বাঙ্গালি হিন্দুরাই ভারতে হিন্দু নবজাগরণ ঘটিয়েছিল। তাই তাদের খতম করাই হলো জেহাদি ও মোল্লাবাদীদের লক্ষ্য। □

জাতীয় জীবন-মরণ সমস্যায় আজও অপরিহার্য যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের পথনির্দেশ

ড. দীনেশ চন্দ্র সিংহ

অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের পূর্বাংশে— যা পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অনুসারে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশ নামে পৃথক দেশের মর্যাদা লাভ করেছে, অনেক বাবাজী, মাতাজী, গুরুজী, স্বামীজী, দাদাজী, ভাইজী, ব্রহ্মচারী, পরমহংস, ত্রিকালজ্ঞ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধপীঠ, মঠ, মন্দির, আশ্রমে দিবারাত্র নর্তন-কীর্তন, সাধন-ভজন, ভোজন-পূজন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। সাড়ম্বরে পালিত হতো মহাপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোধান উৎসব। তাতে কত মাদলের সুগভীর নিনাদে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হতো। নামকীর্তনের সুরঝংকারে পাখি সব নীরব হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে নিয়ে যেত। কোন গুরুর চেলারা কত মন চাল-ডালের খিচুড়ি পাকাত, তা নিয়ে চলত অঘোষিত প্রতিযোগিতা। অগণিত শিষ্য-শিষ্যার দল ভাবত এভাবে সুখেই তাদের দিন যাবে। তারপর একদিন পালে বাঘ পড়ল। এই বাঘ পড়ার পূর্বাভাস কোনো ত্রিকালদর্শী গুরুবাবা, গুরুমা-রা তাদের শিষ্যমণ্ডলীকে দিতে পারেননি। তার ফলে অকালে প্রাণ হারাল শত সহস্র একনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্যের দল; মান-ইজ্জত হারাল তাদের মা-বোনেরা। কোনো কোনো গুরু মহারাজ মাতাজীদের নিয়ে রাতারাতি পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এলেন— পড়ে রইল তাদের সাধের আশ্রম, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ভজন মন্দির। সেসব আজ বিধর্মীর দখলে। কিংবা নিশ্চিহ্ন।

এঁদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম হিন্দুদের দুর্দিনের সাথী যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। ১৯৩২ সালে হিন্দুরা যাকে মহাত্মা বানিয়েছে, সেই এমকে গান্ধী গেলেন বিলাতে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে— ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে জাহির করতে, কিন্তু গিয়ে দেখেন মুসলমান, শিখ, পারসিক, দলিত, রাজা-মহারাজাদের প্রতিনিধিরা সভা আলো করে বসে আছেন। তারা সবাই নিজ সমাজের প্রতিনিধি। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি কেউ নেই। গান্ধীজীকে কেউ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে স্বীকারও করলেন না— তিনি হিন্দু কংগ্রেসের প্রতিনিধি রূপেই স্বীকৃতি পেলেন। বৈঠক থেকে ফিরলেন হিন্দু সমাজকে বর্ণহিন্দু ও তপশিলি হিন্দুতে দ্বিধাবিভক্ত করার উপঢৌকন নিয়ে। উপরন্তু কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের মাধ্যমে বঙ্গের শাসনভার চিরস্থায়ীভাবে মুসলমানদের হাতে অর্পণ করার সাংবিধানিক গ্যারান্টিও দেওয়া হলো।

বঙ্গের হিন্দুরা পড়ল অথই জলে। বঙ্গের শাসন ব্যবস্থা থেকে তাদের সুখ-শান্তি চিরতরে নির্বাসিত। তাদের বিদ্যার গৌরব, বুদ্ধির গৌরব, সাহিত্য- সংস্কৃতির গৌরব তো চিরতরে ধূলিসাৎ হবার ব্যবস্থা হলোই; এমনকী নারীজাতির মানসম্মান নিয়ে বাঁচার অধিকারও নিজেদের হাতে রইল না। মুসলমানরা যেন সাপের পাঁচ-পা দেখেছে, বঙ্গের শাসনভার তাদের হস্তগত হতে না হতেই ব্রিটিশ শাসনে গুটিয়ে থাকা তাদের নখদন্ত বিকশিত হয়ে

প্রতিবেশী হিন্দুদের উপর আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে।

আর কেউ না জানুক, যুগন্ধর স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের কাছে বঙ্গের হিন্দুদের জীবনে এই ঘনায়মান দুর্যোগের বার্তা পৌঁছুতে বিলম্ব হয়নি। সারা বঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর সঙ্ঘের নীতি ও আদর্শ প্রচারে নিয়োজিত প্রচারকদের মাধ্যমে অসহায় হিন্দু নরনারীর আর্তনাদ ভেসে আসতে থাকে। '১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আচার্যদেবের আদেশে জুলাই মাসে কুমার সিংহ হলে এক সম্মেলনে কলকাতার হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিকগণকে লইয়া যে সম্মেলন হয়, উহাতে সঙ্ঘকর্মীগণ বিভিন্ন জেলায় হিন্দু নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বর্ণনাপূর্বক হিন্দু নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সম্মেলনে আচার্যদেব বঙ্গের 'বিপন্ন হিন্দুর আত্মরক্ষার উপায় সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন, তাহাতে হিন্দু নেতৃবৃন্দের হৃদয়ে চৈতন্য ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয়।

'...বঙ্গের হিন্দু আজ নানা ভাবে বিপন্ন ও লাঞ্ছিত।...বিভিন্ন জেলায়, শহরে ও গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শতাধিক মিলন মন্দিরের কার্যতৎপরতার মধ্য দিয়া প্রতি সপ্তাহে যে সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে বুঝিতেছি— বঙ্গের পল্লীগ্রামে কোনো হিন্দুর ধন-প্রাণ-মান এবং স্ত্রী কন্যার ইজ্জত লইয়া বসবাস একপ্রকার অসম্ভব। ...দীর্ঘকাল হিন্দুরা মুখ বুজিয়া সহিয়া আসিতেছে; প্রতিবাদটি পর্যন্ত করে নাই; বরং কংগ্রেসের মধ্য দিয়া মিলন ও শান্তি স্থাপনের জন্য বহু প্রকার চেষ্টা চালিয়েছে; দাবির পর দাবি মিটানো হইতেছে; কিন্তু উৎপীড়নের স্রোত উপশম হওয়া দূরের কথা, বন্যার জলের ন্যায় দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। ফলে নীরব সহিষ্ণুতার শেষ প্রান্তে আসিয়া হিন্দুরা আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান।' (শ্রীশ্রীযুগাচার্য জীবন-চরিত : স্বামী বেদানন্দ)

পূর্ববঙ্গের সমৃদ্ধতর জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ খুইয়ে, বিপুল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হারিয়ে এবং মান-ইজ্জত বাঁচাতে ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসার ৭৩ বছর পর (১৯৩৮-২০১১) হিন্দুদের অবস্থা কি ১৯৩৮ সালের থেকে উন্নত হয়েছে নাকি অবনত হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গের একটা বৃহৎ অংশে কি 'হিন্দুর ধন-মান-প্রাণ ও স্ত্রী-কন্যার ইজ্জত লইয়া বসবাস একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েনি?

২০১১ সালের কথা ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাই ১৯৩৮ সালের কথায়। তৎকালীন সঙ্গীন অবস্থায় হিন্দুদের বাঁচার পথ প্রদর্শন করেছিলেন আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ। 'আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আত্মরক্ষার্থ শক্তিসংগ্রহের উপায়— হিন্দু সঙ্ঘশক্তি সংগঠন। হিন্দু সঙ্ঘশক্তি গঠনের জন্য চাই উন্নত ও অনুন্নত যাবতীয় শ্রেণীর হিন্দু-জনসাধারণের মিলন। এই মিলনকে অব্যাহত করিয়া তুলিতে হইলে একদিকে উন্নত শ্রেণীর হিন্দুকে হৃদয়বান দরদি হইয়া, অস্পৃশ্যতার গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া অনুন্নত হিন্দু ভ্রাতৃগণকে ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার দান করিতে হইবে।

অপরদিকে অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুকেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর স্তোকবাক্য ও প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া উন্নত শ্রেণীর হিন্দু ভ্রাতৃগণের প্রতি বিদ্বেষ ও ক্ষোভ বিসর্জন দিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে হিন্দু-মিলনযজ্ঞে যোগদান করিতে হইবে। আত্মরক্ষার প্রশ্নকেই সর্বপ্রধান বলিয়া জাতির সম্মুখে ধরিতে হইবে। তাহা হইলে খুঁটিনাটি ভেদ বিবাদের কথা আপনা হইতেই তলাইয়া যাইবে।' (ঐ)

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতে হিন্দুদের জীবন-মরণ সমস্যায় আত্মরক্ষার একমাত্র রক্ষাকবচের নির্দেশ ইদানীংকালে আর কোনো ধর্মীয় গুরু দিয়েছেন কি? স্বামী বিবেকানন্দ যে কথা কাগজে-কলমে বলেছেন, স্বামী প্রণবানন্দজী তাকেই হাতে-কলমে প্রয়োগ ও প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এই পথ ছাড়া হিন্দুদের বাঁচবার আর দ্বিতীয় পথ নেই। *(পুনঃ প্রকাশিত)*

স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ এবং শৈবতন্ত্রের গুরু পরম্পরা

রণজয় বিশ্বাস

যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ ইংরেজি ১৮৯৬ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি মাঘী পূর্ণিমার পবিত্র দিনে অখণ্ড পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিগত ৪০০ বছরে যে কয়েকজন হিন্দু সন্ন্যাসী তথা সমাজ সংস্কারক জন্মেছেন তার মধ্যে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু হিন্দু সংগঠক এবং যুগ সংস্কারক ছিলেন না, তিনি বঙ্গপ্রদেশে সবচেয়ে বড়ো বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা ছিলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে সার্বিক ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতীর পরেই সবথেকে বড়ো হিন্দুত্বের প্রচারক এবং সংগঠক ছিলেন স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ।

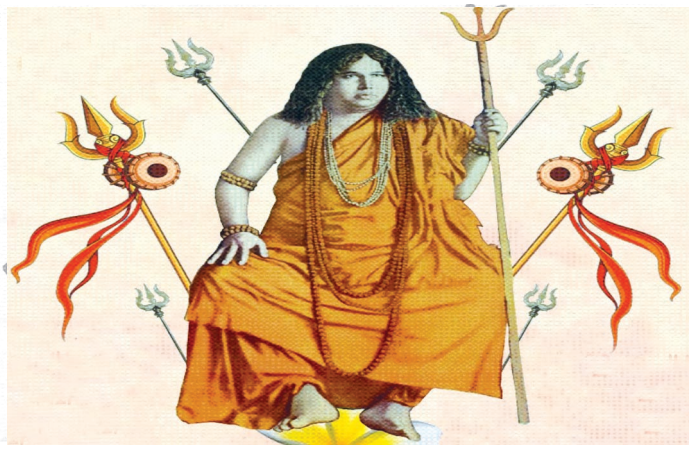

স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ দু'জনের থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁর সাধন জীবনে। প্রথম জীবনে তার গুরুদেব ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী, গোরক্ষপুরের মহাযোগী বাবা গম্ভীরনাথজী মহারাজ। ১৯১৩ সালে ১৭ বছর বয়সে তিনি দীক্ষালাভ করেন এবং ১৯১৬ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। পরবর্তীকালে শৈবতন্ত্রের পরম্পরায় গোবিন্দানন্দজী তাঁর সন্ন্যাস গুরু হন। ১৯২৪ সালে প্রয়াগে অর্ধকুম্ভমেলায় স্বামী গোবিন্দানন্দ মহারাজের নিকট আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামী প্রণবানন্দ নামে পরিচিত হন। বঙ্গপ্রদেশের মাটিতে শৈবতন্ত্রের পরম্পরা শুরু হয় বামদেবের (বামাক্ষ্যাপার) গুরুদেব ব্রজবাসী কৈলাসপতি বাবা তথা ডাবুকের কৈলাসপতি বাবার হাত ধরে। কৈলাসপতি বাবা স্বয়ং বশিষ্ঠদেবের কাছ থেকে দীক্ষা পান। শুধু তাই নয়, যোগ ও তন্ত্র যে সংযুক্ত পরম্পরা সেই পরম্পরাতে কৈলাসপতি বাবার থেকে বড়ো সাধক আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়নি। কৈলাসপতি বাবার প্রধান শিষ্য চারজন ছিলেন (১) বামাক্ষ্যাপা, (২) অভয়ানন্দজী, (৩) কুমারানন্দ, (৪) হরিহরানন্দ। এর মধ্যে হরিহরানন্দ ছাড়া বাকি সমস্ত শিষ্য এবং গুরু পরম্পরা লুপ্ত হয়ে গেছে। হরিহরানন্দ সম্প্রদায় তার শিষ্য পরম্পরায় আজও মুর্শিদাবাদের কান্দীতে দোহালিয়া কালীবাড়ির পাশে হরিহরানন্দ সেবাশ্রম আশ্রম বিদ্যমান। নরেন ব্রহ্মচারী কৈলাসপতি বাবার ষষ্ঠ পুরুষ যিনি আজও কৈলাসপতি বাবার সাধনাকে বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের মাটিতে জিইয়ে রেখেছেন।

বর্তমান ভারতে চৌষট্টি যোগিনী তন্ত্র মূলত তিনটি কুলে প্রতিষ্ঠিত ও বিভাজিত। (১) কালীকুল, (২) শ্রী কুল, (৩) সরস্বতী কুল। এর মধ্যে সরস্বতী কুল শুধুমাত্র কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠিত। এই কুলের প্রধান আরাধ্যা দেবী হলেন তন্ত্রের মহাসরস্বতী।

(২) শ্রীকুল বঙ্গ, বিহার ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা ও অসমের কিছু অংশ বাদ দিয়ে সারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত। এই কুলের প্রধান আরাধ্যাদেবী হলেন ত্রিপুরাসুন্দরী। (৩) কালীকুল অখণ্ড বঙ্গ তথা অসম। বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে নিজস্ব পরম্পরা। বাঙ্গালি জাতি হিসেবে গত দেড় হাজার বছরে ভারতীয় উপমহাদেশের সনাতনী আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বঙ্গের নিজস্ব অবদান দু'টি--- প্রথমটি শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব এবং দ্বিতীয়টি বঙ্গীয় কালীকুলে শৈবতন্ত্রের নিজস্ব পরম্পরাগত সাধনা।

কালীকুলের সাধনায় শিব ও শক্তির সমযুক্ত হয়ে কৈবল্যপ্রাপ্তির সাধনা এবং পরম শিবের উপর ভিত্তি করে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগানোর সাধনা। কৃষ্ণানন্দ আগামবাগীশ, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা, দাতাবাবা, খাকিবাবা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, মেহেরের কালীবাড়ির সর্বানন্দ, ডাবুকের কৈলাসপতি বাবা, মিহির কিরণ ভট্টাচার্য্য, বক্রেশ্বরের অঘোরীবাবা, শিবকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য— এরা সবাই কালিকুলের উল্লেখযোগ্য সাধক।

স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের জীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন ডাবুকের কৈলাসপতি বাবা। একাধারে যোগ, অপর দিকে তন্ত্র, অন্যদিকে হিন্দু জাতীয়তাবোধ, সেই সঙ্গে অষ্টসিদ্ধি অর্জন এবং দশমহাবিদ্যার বিশেষ আশীর্বাদ--- এই সবটাই ডাবুকের কৈলাসপতি বাবার কল্যাণে যুগাচার্য প্রণবানন্দজী তথা বিনোধ সাধু লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা এবং ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভায় নিয়ে আসা এই দুটোই স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের জীবনের অনন্য কীর্তি। ১৯৪১ সালে ৮ জানুয়ারি মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তাঁর চিরসমাধি হয়। স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ এবং ডাবুকের কৈলাসপতি বাবা তথা নাথযোগীদের অন্তর্গত শৈবতন্ত্রের পরম্পরায় আজও অখণ্ড বঙ্গে তন্ত্র সাধনায় প্রধান ধারা হিসেবে বয়ে চলেছে।

ফঃ ৩

শিক্ষা পোর্টালের হাত যশে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুলছুটের সংখ্যা শূন্য

বিশ্বপ্রিয় দাস

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রতিবেদনে নাকি বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে স্কুলছুটের সংখ্যা একেবারেই নেই। কথাটা কতটা সত্যের উপর নিভরশীল তা অবশ্যই সন্দেহাতীত নয়। ২০২৩-২৪-এর UDISE + রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যের প্রাথমিকের স্কুল ছুটের সংখ্যা একেবারে শূন্য। সত্যিই এমন ঘটনা যদি ঘটেই থাকে, তাহলে অবশ্যই বাহবা যোগ্য। একটু পিছন ফিরে যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এই ড্রপ আউট বা স্কুলের ছুটের যে শতাংশের হিসেব পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে ৮.১ শতাংশ। কী এমন উন্নতি ঘটল যে এই আট শতাংশ থেকে একেবারে শূন্যে নামিয়ে আনলেন আমাদের শিক্ষককুল?

২০২৩ সালে রাজ্যের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে সেই সময়ে ২০২১-২২ সালের স্কুল ছুটের সংখ্যা ৮.৬ শতাংশ। সেই সময়ের বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এই হার দেখে, সরকারিভাবে এমন ভাবনার কথাও উঠে এসেছিল যে ছাত্রাল্পতায় বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে, বিশেষ করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ভয়ংকর কয়েকটি বিষয় লুকিয়ে রয়েছে এর পিছনে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণত যে সব ছাত্র-ছাত্রী আসে, তারা আসে একেবারে নিম্নবিত্ত শ্রেণী, নয়তো-বা বস্তি অঞ্চল থেকে। এইসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিকাংশই একেবারে ফার্স্ট লার্নার। ফলে বিদ্যালয়ে প্রথম প্রথম তাগিদ থাকলেও মেয়ে বা ছেলেরা একটু বড়ো হলে, তাদের তাগিদ কমতে থাকে সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশের পারিপার্শ্বিকতায়। স্কুল ছুট শুরু হয় এই সময় থেকেই। ছোটো বয়েসেই যদি দেখা যায় সেই শিশুটির একটি ভাই বা বোন জন্ম নিল, তাকে দেখভাল করার জন্য ওই শিশুটির বিদ্যালয়ে আসা কমতে থাকে। মা পেটের টানে কারও বাড়িতে বা অন্য কোথাও কাজ করতে চলে যান। আর বাড়িতে ভাই-বোনকে দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ে শিশুটির ওপর। ফলে তার স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা পোর্টালে তারা কিন্তু রয়ে যায় বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রাপ্লতার জন্য শিক্ষক বা শিক্ষিকারাও তাই শিশুটি স্কুলে কেন আসছে না, সেই খোঁজ রাখার প্রতি অনীহা দেখায়। আর শিশুটি বিদ্যালয়ের বাইরে থাকলেও খাতায় কলমে স্কুলছুট হয় না। এদের হিসেব কি আছে সরকারের কাছে?

শহরের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শুধু নয়, এই চিত্র শহরতলির বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। গত দশ বছরের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, শেষ পর্যন্ত কতজন নিয়মিত আসছে, সেটা জানার চেষ্টা করলেই প্রকৃত ছবি সামনে আসবে। এমনকী আরও খোঁজ নিলে জানা যাবে, এই কলকাতা শহরের বুকে শুধুমাত্র ছাত্র নেই বলে কত বিদ্যালয়কে বন্ধ করে দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অন্য বিদ্যালয়ে হয় ইউটিলাইজেশন, নয়তো বা বদলি করা হয়েছে।

UDISE + ফর্ম পূরণ করার সময় ছাত্র বা ছাত্রী সংখ্যা লেখার সময় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা পোর্টালে যে ছাত্রী বা ছাত্র সংখ্যা থাকে সেটাই লেখা হয়। আর একটি শিশু যখনই বিদ্যালয়ে ভর্তি হলো, সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটির পর একটি শ্রেণীতে উঠে যায়। তার শিক্ষক গুণগত উৎকর্ষতা বা মান কী হলো, সেটা প্রতিফলিত হয় না। দেখা গেছে অক্ষর জ্ঞান পর্যন্ত অনেকটাই নিম্ন মানের। এদিকেও লক্ষ্য রাখার মতো কেউ নেই।

ফলে যার ওপর ভিত্তি করে স্কুলছুট শূন্য বলা হচ্ছে, সেটা কি বৈজ্ঞানিকভাবে একেবারে নির্ভুল বলা যায়?

মূলত যাদের ঘাড়ে দায়িত্ব ছিল স্কুল ছুটদের স্কুলমুখী করার, তারা স্কুল ছুটদের স্কুলে আনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন বলে জানান। এও জানান যে, স্কুলে আনার ক্ষেত্রে দিনের পর দিন বাড়িতে গেলেও আসেনি তারা। এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে শিশুটি মায়ের সঙ্গে কাজে চলে গেছে, নয়তো পাড়ার লোকের কাছে নানা গালি খেয়ে ফিরে এসেছেন। সাফল্য যে আসেনি তা নয়, শতাংশের হিসেবে তা ২ বা ৩ শতাংশ। এখানেও কেউ নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না যে একশো শতাংশ স্কুল ছুটকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন তারা। ফলে ওই যে আগেই বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা পোর্টালে অন লাইনে একবার ভর্তি হলে, আর নাম মুছে যায় না। সে যতদিন না পঞ্চম শ্রেণীতে উঠে প্রাথমিকের গণ্ডি পেরচ্ছে, ততদিন সে ছাত্র হিসেবে বিরাজমান। স্কুল ছুট আর হলো কই?

ফলে পুরোটাই একটা ভাওতাবাজির নামান্তর মাত্র। যা কিনা রাজ্য সরকারের একটি অনন্য কীর্তি। □

পৌষ সংক্রান্তিতে ত্রিপুরার মহিলারা

সুতপা বসাক ভড়

উত্তরপূর্ব ভারতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হলো ত্রিপুরা। মা ত্রিপুরেশ্বরী হলেন এই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ একটি রাজ্য। বাঙ্গালি সংখ্যাধিক্য থাকার কারণে বঙ্গ সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব সর্বত্র দেখা যায়। বারো মাসে তেরো পার্বণ এখানে স্পষ্টত অনুভূত হয়। বেশিরভাগ মানুষই ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে বেশি করে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ঊনকোটি, পিলাক ইত্যাদি স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে। এই রাজ্যে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধারার বহু নিদর্শন দেখা যায়। রাজমালাতেও আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

পৌষ-সংক্রান্তির সময় সমগ্র ত্রিপুরা কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে থেকেই চতুর্দিকে কৃষ্ণনাম শোনা যায়। ব্যক্তিগত ও সর্বজনীনভাবে কৃষ্ণনাম কীর্তনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রায় প্রত্যেক হাটেবাজারে ছাপান্ন প্রহর অর্থাৎ সাতদিন ব্যাপী নামগান হতে থাকে। সেখানে স্থানীয় মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা সন্তানদের নিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন বাড়ির সকল সদস্য, যে যেখানেই থাকুক না কেন, সবাই একত্রিত হয়। সারাদিন পারিবারিক মিলনের নামে চলতে থাকে খাওয়াদাওয়া, বার্তালাপ। দোকান-বাজার প্রায় বন্ধই থাকে। সন্ধ্যের সময় বাড়ির লোকজন বাইরে থাকা পছন্দ করে না। তাড়াতাড়ি রান্না-খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ে। তবে সারাদিন ধরে বাড়ির ছোটোরা খড় দিয়ে ছোটো ছোটো ঘরের মতো বানায়। পরের দিন ভোরবেলা উঠে ওই খড়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। নিকটবর্তী নদী-পুকুর থেকে স্নান করে এসে ওই আগুনে হাত সেঁকে। মহিলারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন ঘরের কাছে। পূজাপাঠ সেরে ঢেঁকিতে চাল গুড়ো করে নেন। শুরু হয় পিঠেপুলি বানানো।

কাজের ফাঁকে উঠান পরিষ্কার করে গোবর দিয়ে নিকিয়ে সুন্দর আলপনা দেন।

তুলসীমঞ্চকে নিকিয়ে ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলেন। বাড়িতে যথেষ্ট পরিমাণে পিঠেপুলি, বাতাসা-মঠ-কদমা, তিলের খাজা, ফল-মিষ্টি জোগাড় রাখেন। দুপুরের খাওয়ার পর প্রায় প্রত্যেক বাড়ি থেকেই কেউ না কেউ এসে একত্রিত হয়ে নগর কীর্তনে বেরিয়ে পড়েন। খোল-করতাল-হারমোনিয়াম সহযোগে আবালবৃদ্ধবনিতা পথে পথে কীর্তন করতে থাকেন। প্রত্যেক বাড়িতে বেশ কয়েকটি কীর্তনের দল আসে। সংকীর্তন করতে করতে তারা বাড়িতে প্রবেশ করে তুলসীমঞ্চের সামনে এসে কীর্তন করেন। তুলসীতলায় থালায় ফল-মিষ্টি রাখা থাকে। তাঁরা তুলসীমঞ্চকে প্রদক্ষিণ করতে করতে কীর্তন করেন। তারপর হয় 'হরির লুঠ'। বাড়ির মহিলারাও ভক্তিভরে তাঁদের সঙ্গে তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে তাঁদের হতে ওই প্রসাদ তুলে দেন। অনেকসময় তাঁরাও ওই কীর্তন দলের সঙ্গে নামগান করতে করতে চলেন। বাকি মহিলারা আবার তুলসীমঞ্চ সাজিয়ে অপেক্ষা করেন পরবর্তী কীর্তনদলের জন্য। এই অনুষ্ঠানটিতে গৃহিণীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিকতার দৌড়ে যখন মহিলারা নিজ সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে তখন ত্রিপুরার মহিলাদের এই ভূমিকা আমাদের মুগ্ধ করে। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তাঁরা এই পরম্পরা ধরে রেখেছেন। শারীরিক পরিশ্রমকে অগ্রাহ্য করে তাঁদের যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, তা আকৃষ্ট করে সেখানকার নতুন প্রজন্মকেও। সেজন্য ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরাও অবলীলায় আনন্দে মত্ত হয়ে করে চলেছে কৃষ্ণনাম।

এভাবেই আমাদের দেশে আধ্যাত্মিকতার ধারা আবহমানকাল থেকে বয়ে চলেছে। এই পরম্পরা ধরে রাখার জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে মহিলারা। □

কিডনির সমস্যা ও কিছু কথা

ডাঃ বলরাম পাল

কিডনি হলো এমন একটি অঙ্গ, যা শুধুমাত্র আমাদের শরীরের রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তাই নয়, এই অঙ্গটি শরীরের ইলেক্ট্রোলাইট লেভেল ব্যালেন্সিং বা রক্তে সোডিয়াম- পটাশিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনেও মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শরীরের বিপাকক্রিয়াজাত নানা বর্জ্য পদার্থ যেমন ইউরিক অ্যাসিড, ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন, ক্রিয়েটিনিন এগুলিকেও নিষ্কাশন করতে সাহায্য করে। কিডনির কার্যপ্রণালীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, কিডনি কোষের সেন্সরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় কতটা পরিমাণ জল মূত্রের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হবে, আবার ইলেক্ট্রোলাইটস্ কন্সেনট্রেশন অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আয়নের মাত্রাই বা কীরকম হবে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নানা ব্যায়ামের ফলে বা কোনো অসুস্থতার কারণে শরীরে ডিহাইড্রেশন হলো, সেক্ষেত্রে কিডনিকে কিন্তু প্রয়োজনীয় জল ধরে রাখতেই হবে এবং তার ফলে মূত্র গাঢ়, ঘোলাটে হবে। আবার যদি প্রচুর জলপান করা হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে মূত্র স্বচ্ছ হবে। এই যে কার্যপ্রণালী সেটি আবার নিয়ন্ত্রিত হয় কিডনি থেকে উৎপন্ন রেনিন নামক হরমোন দ্বারা, যেটি আবার আমাদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। কিডনির মধ্যে এরিথ্রোপয়েটিন নামক এক প্রকার হরমোন থাকে, যেটি বোন ম্যারো (অস্থিমজ্জা)-কে উদ্দীপিত করে লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনে সাহায্য করে। কিডনির মধ্যে এক প্রকার কোষ থাকে, যেটি রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা রক্ষা করে। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে এরিথ্রোপয়েটিন লেভেল বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে শুরু হয়ে যায় লোহিত রক্তকণিকা (আরবিসি) তৈরির প্রক্রিয়া।

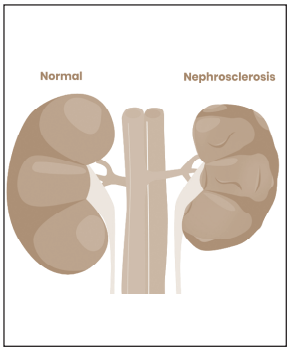

কিডনি ফেলিয়োরের কারণ : হঠাৎ কোনো কিডনি ইনজুরির (অর্থাৎ, বৃক্কে কোনো আঘাতের) কারণে সংকটজনক পরিস্থিতি হতে পারে। তখন তাকে অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়োর বলা হয়। আবার দীর্ঘ রোগভোগের ফলে ধীরে ধীরে কিডনির স্বাভাবিক ক্রিয়া বন্ধ হতে থাকে, তখন তাকে ক্রনিক রেনাল ফেলিয়োর বলা হয়।

যদি একটি কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন অন্যটিকে সচল রাখা জরুরি হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে ডায়ালিসিস, অথবা কিডনি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে। আবার মাসের পর মাস বা বছরভর যদি কোনো রোগীর উচ্চ রক্তশর্করাজনিত রোগ বা মধুমেহ এবং উচ্চ রক্তচাপজনিত ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে রাখার চিকিৎসা না হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ক্রনিক রেনাল ফেলিয়োর হতে পারে। দীর্ঘদিন ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস, কিডনি স্টোন বা প্রস্টেট গ্রন্থির রোগের কারণেও ক্রনিক রেনাল ফেলিয়োর হতে পারে।

কিডনি ফেলিয়োরের লক্ষণসমূহ : প্রাথমিকভাবে রেনাল ফেলিয়োরের কোনো লক্ষণই থাকে না। যেহেতু দেহের রাসায়নিক বিক্রিয়াজাত বর্জ্য পদার্থ এবং শরীরের অতিরিক্ত তরল পদার্থ (এক্সেস বডি ফ্লুইড)-কে নিষ্কাশন করাই কিডনির প্রাথমিক কাজ, সেহেতু রেনাল ফেলিয়োর থাকলে বা রেনাল ফাংশন ঠিকঠাক না হওয়ার ফলে, রোগী তার শরীরের জলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং ইলেট্রোলাইট ব্যালেন্স করতে পারে না। ফলে রক্ত থেকে পটাশিয়াম নিষ্কাশন না হতে পারলে অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন হয়, যার ফলে আচমকা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আবার এই কারণে লোহিত রক্তকণিকা তৈরিতেও সমস্যা হয়, যার ফলে অলসতা, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, সাধারণ ফোলাভাব (ইডিমা), ক্ষুধামান্দ্য, ক্লান্তি বা অবসাদ, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। ইউরেমিয়া হয়ে রক্তে ইউরিয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে এনকেফালোপ্যাথি বা পেরিকার্ডাটাইটিস হতে পারে, তেনমই রক্তে যদি ক্যালশিয়ামের মাত্রা কমে যায়, সেক্ষেত্রে হাইপোক্যালশিমিয়া হতে পারে।

প্রস্ট্যাটিক হাইপারট্রফি বা প্রস্টেট ক্যান্সার ইউরেথ্রা বা মূত্রনালীকে ব্লক করে। যার ফলে ব্লাডার খালি হতে না পারার কারণে কিডনির স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়, ঠিক তেমনই কিডনিতে স্টোন হলেও স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। তবে এটা ঠিক যে কিডনি স্টোন সাধারণত একইসঙ্গে দু'দিকেই হয় না। তাই এই ক্ষেত্রে কমপ্লিট রেনাল ফেলিয়োরের সম্ভাবনা কম। যদিও রেনাল ফেলিয়োর নানাবিধ কারণে হয়, তাই লক্ষণও কারণ অনুযায়ী বহুবিধ হয়। যাই হোক প্রাথমিক অবস্থায় যদি কারণ অনুসন্ধান করে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া যায়, ব্লাড প্রেশার ও ডায়াবেটিসকে যদি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তবে রেনাল ফেলিয়োর রোধ করা সম্ভব। তবে এটাও ঠিক, যদি কিডনি সম্পূর্ণভাবে ফেল করে, সেক্ষেত্রে ডায়ালিসিস বা ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া উপায় থাকে না।

রেনাল ফেলিয়োর হয়েছে বুঝবেন কীভাবে : রেনাল ফেলিয়োর হয়েছে বা কিডনি ঠিকঠাক কাজ করছে কি না তা বোঝবার জন্য ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন, ক্রিয়েটিনিন, গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট (জিএফআর) পরিমাপ করতে হয়। রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা উচ্চ হলে বুঝতে হবে জিএফআর বা কিডনির রক্ত পরিশোধনের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। যদি প্রাথমিক অবস্থায় ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা স্বাভাবিক থাকে, সেক্ষেত্রে কিডনি ফাংশন বোঝবার জন্য ইউরিন টেস্টের মাধ্যমে অ্যাবনর্মাল সেলস্ বা আরবিসি কাউন্ট এবং ইলেক্ট্রোলাইটস্ কন্সেনট্রেশন ঠিক আছে কি না দেখা হয়। এছাড়া অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড (ইউএসজি) এবং কিডনি বায়োপ্সির মাধ্যমে বোঝা যায় কী ধরনের রেনাল ফেলিয়োর হয়েছে।

সাধারণ ব্যবস্থাপনা : (১) নিঃসৃত মূত্রের পরিমাণ বিবেচনা করে ঠিক করতে হবে কতটা ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন করতে হবে। (২) ইলেক্ট্রোলাইট ব্যালান্স রক্ষা করতে হবে। (৩) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। (৪) অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা থাকলে সেটা ঠিক করতে হবে। (৫) প্রোটিন রেস্ট্রিকশন করতে হবে। পরিশেষে বলি উচ্চরক্তচাপ (হাইপারটেনশন) এবং ডায়াবেটিসকে যদি নিয়ন্ত্রণে না রাখা যায়, তাহলে কিন্তু কিডনির সমস্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাই হাইপারটেনশন ও ডায়াবেটিসকে কখনোই অবহেলা করা উচিত নয়। □

নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে কলকাতায় ছাত্র-যুব সম্মেলন

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ২৩ জানুয়ারি কলকাতার জোড়াসাঁকোস্থিত রথীন্দ্র মঞ্চে ছাত্র-যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মহাবিদ্যালয় ছাত্র-যুবকেরা সম্মিলিত হন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই 'সুভাষচন্দ্র' চলচ্চিত্রের চয়নিত অংশ প্রদর্শিত হয়। এরপরেই বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ মঞ্চে ভারতমাতা, স্বামীজী, ডাক্তারজী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে সম্মেলনের শুভারম্ভ করেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, প্রান্ত কার্যবাহ তথা স্মারক সমিতির সম্পাদক শশাঙ্ক শেখর দে, এলআইএলডি-র নির্দেশক ডাঃ ললিত নারায়ণ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. পঙ্কজ কুমার রায়। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত ও 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গাওয়ার পর চারজন ছাত্র নেতাজীর বাণী পাঠ করে শোনান। ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির সম্পাদক শশাঙ্কশেখর দে অনুষ্ঠানের অতিথিদের বরণ করে নেন। প্রধান অতিথি ডাঃ নারায়ণ নেতাজীর জীবনের প্রেরণাদায়ী প্রসঙ্গ তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। একক গানের পরই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা রামদত্ত চক্রধর নেতাজীর দেশভক্তির উল্লেখ করে বলেন, নেতাজী বলেছিলেন তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। কিন্তু আজ রক্তের চেয়ে বেশি প্রয়োজন সময় দানের। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হয়ে দেশের জন্য নিত্য সাধনা করা, দেশের জন্য সময় দেওয়া এক মাস বা এক বছর বা তারও বেশি। সম্মেলন সঞ্চালনা করেন কলেজ ছাত্রপ্রমুখ তরুণ বেরা।

স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবনে নেতাজী জয়ন্তী উদ্‌যাপিত

জয়শ্রী পত্রিকা ট্রাস্ট এবং অসংখ্য দেশপ্রেমিকদের উদ্যোগে গত ২৩ জানুয়ারি কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবনের রামকৃষ্ণ সভাঘরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত কণ্ঠে আইএনএ-সংগীত (INA-anthem)-এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর 'Netaji's Path : Unveiling the foot-steps into Kashmir'-শীর্ষক একটি বক্তব্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত তাঁর একটি মৌলিক গবেষণা উপস্থাপন করেন সোমদেব চট্টোপাধ্যায়। এরপর বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড় মঠের সহ-সাধারণ সম্পাদক স্বামী বলভদ্রানন্দজী মহারাজ। বক্তব্যের বিষয় ছিল 'সুভাষচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতা'। এরপর রাজদীপ সাহার পরিকল্পনায় প্রস্তুত 'Inauguration of Tagore : Picto-Graphic Biography of Rabindranath'-শীর্ষক একটি পুস্তকের আবরণ উন্মোচন করেন পূজনীয় মহারাজ। এরপর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কিছু প্রিয় গান ও কীর্তন পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী মোহন কুমার সাহা। এরপর সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও নেতাজী গবেষক ডাঃ মধুসূদন পাল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জয়শ্রী পত্রিকা ট্রাস্টের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ইন্দ্রাশিস ভট্টাচার্য। জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক মানুষের সমাগমে সভাঘরটি ছিল পূর্ণ। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির মাতৃসম্মেলন ও আলোচনা সভা

গত ২৪ জানুয়ারি রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে কলকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটি সভাগৃহে আয়োজিত হয় মাতৃসম্মেলন ও আলোচনা সভা। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রমুখ সঞ্চালিকা শান্তাক্কা, প্রব্রাজিকা বিদ্যাপনা মাতাজী, প্রান্ত সঞ্চালিকা

শ্রীমতী মহুয়া ধর, অখিল ভারতীয় সহ কার্যবাহিকা সুনীতা হলদেকর।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বেদ মন্ত্রোচ্চারণ করেন সেবিকা গার্গী রায়। উপস্থিত বিশিষ্ট জনেদের পরিচয় করিয়ে দেন প্রান্ত সহ কার্যবাহিকা গরিমা বেঙ্গানী। সঙ্গীতা চৌধুরীর একক গানের পর শান্তাক্কাজী বর্তমান পরিস্থিতিতে নারীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হলো পরিবার, সংস্কারিত পরিবারের মাধ্যমেই ব্যক্তির বিকাশ, ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রের বিকাশ। ভারত সর্বদাই বসুধৈব কুটুম্বকমের কথা বলে এসেছে। সকলের প্রতিই আমাদের কর্তব্য রয়েছে। পরিবেশ রক্ষা করা, সমরসতার ভাব নির্মাণ করা, নাগরিক হিসেবে কর্তব্য পালন সবকিছু নিজেদের থেকেই শুরু করতে হবে। তার জন্যই রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মরক্ষা, স্বাবলম্বন, জাগৃতির শিক্ষার সঙ্গে ভারতের কথা, নিজেদের পরিচয় এবং হিন্দুত্বের বিষয়ে চর্চা হয়। সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন আনতে হবে নিজেদের জীবনশৈলীতে।

এর পরেই উপস্থিত মাতৃমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনা পর্বে শান্তাক্কাজী বলেন, পরিবারিক মূল্যবোধ নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রভক্তির শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, ক্যারিয়ারের সঙ্গে ক্যারেক্টার নির্মাণও আবশ্যিক। শিশুর প্রকৃত সংস্কার কেন্দ্র হলো পরিবার, তাই পরিবারের সংস্কার এবং বড়োদের আচরণ শিশুকে গড়ে তোলে। সহযোগিতার মানসিকতা এবং সৃজনশীলতার শিক্ষা শিশুকে দিতে হবে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রব্রাজিকা মাতাজী বলেন, নারী ও পুরুষ পাখির দুইটি ডানার মতো, তাই নারীর গুরুত্ব কম নয়। স্বামীজী তাই ভগিনী নিবেদিতাকে নারীশিক্ষার জন্য দায়িত্ব দেন, শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, স্বাবলম্বনের শিক্ষাও প্রয়োজন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহ কার্যবাহিকা গরিমা বেঙ্গানী। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ মৌমিতা বর। কল্যাণ মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

ব্রহ্মচারী জ্যোর্তিময় সরস্বতী শিশু মন্দিরের চক্ষু পরীক্ষা শিবির

গত ২৫-২৬ জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে হুগলি জেলার ব্রহ্মচারী জ্যোর্তিময় সরস্বতী শিশু মন্দির। বৈজ্যনাথ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও শঙ্কর নেত্রালয়ের (কলকাতা) সহযোগিতায় দু'দিন ব্যাপী নিঃশুল্ক চক্ষু পরীক্ষা শিবির হয়।

দু'দিনের এই শিবিরে মোট ৪৬৫ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। তাদের মধ্যে ৬২ জনকে ছানি অপারেশনের জন্য নাম নথিভুক্ত করা হয়। যাদের পরবর্তীতে নিঃশুল্কে ছানি অপারেশন করা হবে। বাকি ৩১৫ জন রোগীকে নিঃশুল্কে চশমা প্রদান করা হবে।

বর্ধমানে সেবা ভারতী মধ্যবঙ্গের নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

গত ২৩ জানুয়ারি নেতাজী জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বর্ধমান নগরে একটি নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে সেবা ভারতী মধ্যবঙ্গ। বর্ধমান রাজবাড়ির লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ মন্দিরে সকাল ১০ টায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে শিবিরের শুভারম্ভ হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা সঙ্ঘচালক তুষার কান্তি হাজরা, মধ্যবঙ্গ প্রান্তের ব্যবস্থা প্রমুখ প্রিয়ব্রত সরকার, সেবা ভারতী মধ্যবঙ্গ সভাপতি অধ্যাপক রাজীব লোচন মহাপাত্র এবং সম্পাদক অনির্বাণ সোম প্রমুখ। সেবা কাজের উপর বক্তব্য রাখেন সম্পাদক অনির্বাণ সোম।

শরণ্যা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের সহযোগিতায় শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। হাসপাতালের মেডিসিন, চক্ষু, দন্ত, ইসিজি, ব্লাড সুগার, পিএফটি, ফিজিওথেরাপি, -সহ মোট দশটি বিভাগের জন্য হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকরা উপস্থিত হন। মোট ১১৮ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

জেলা সঙ্ঘচালকের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে শিবিরের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

মহাকুম্ভমেলায় সংস্কার ভারতীর রাষ্ট্ররত্না শোভাযাত্রা

গত ২২ জানুয়ারি মহাকুম্ভমেলায় আয়োজিত হলো রাষ্ট্ররত্না শোভাযাত্রা। ভারতীয় নারীর শক্তি, ভক্তি, শিক্ষা, সেবা, সমর্পণ, পরাক্রম ও বলিদানের অমর কীর্তিকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে সংস্কার ভারতীর এই আয়োজন।

বঙ্গের তিন প্রমুখ নারী চরিত্র রানি রাসমণি, রানি ভবশঙ্করী ও ভগিনী নিবেদিতা-সহ সারা দেশের অসংখ্য নারীর অবদান সেখানে প্রদর্শিত হয়। সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে তিনজন বঙ্গনারী তনুশ্রী মল্লিক, তনুশ্রী দত্ত রায় ও রূপালি রায়চৌধুরী রূপসজ্জার মাধ্যমে এই তিনটি চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন। সহযোগী হিসেবে ছিলেন জয়দেব বণিক ও শীর্ষ আচার্য্য।

আধুনিক ভারতে সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে অন্যতম নারীচরিত্র লোকমাতা রানি রাসমণি। ব্রিটিশ শাসনকে উপেক্ষা করে দেশ ও সমাজ হিতে তাঁর কাজ অভূতপূর্ব। দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দির স্থাপন তাঁর অনন্য কীর্তি।

ষোড়শ শতকে হাওড়া, হুগলী এবং অবিভক্ত মেদিনীপুরের প্রাচীন ভুরশুট রাজ্যের মহারানি ভবশঙ্করী পাঠান, মুঘল, আফগান আক্রমণকারীর সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের অমর গাথা রচনা করেছেন, যার কারণে তিনি রায়বাঘিনী উপাধিতে ভূষিতা হন।

ভারতকন্যা স্বামীজীর অন্যতম শিষ্যা ভগিনি নিবেদিতা নারী শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রমুখ চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই বছর অহল্যাবাঈ হোলকরের ৩০০তম জয়ন্তী, রানি দুর্গাবতীর ৫০০তম এবং সাধিকা মীরাবাঈয়ের ৫২৫তম জয়ন্তী বর্ষ চলছে। তাঁদের মহান জীবনকে শোভাযাত্রায় প্রদর্শিত করা হয়। শোভাযাত্রায় ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে ২০০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেক প্রান্তের গৌরবময়ী নারী চরিত্রকে সেখানে উপস্থাপন করার অভিনব প্রয়াস করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিংহ শেখাওয়াত। তিনি বলেন, কুম্ভমেলার এই দিব্য ও পবিত্র স্থানে সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি রয়েছে। সকলে ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আয়োজনের উপর নজর রাখছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যখন নতুন ইতিহাস রচিত হতে চলেছে, যখন ভারতের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক প্রভূত্ব সমগ্র বিশ্বের নজর কাড়ছে, এমতাবস্থায় মহাকুম্ভ মেলায় এই শোভাযাত্রার আয়োজন বিশ্বকে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিচ্ছে। ভারত নারীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে এবং তাদের প্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দেয়, তা আরও একবার প্রমাণিত হলো।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের ভারতমাতা পূজন

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের চারটি পালনীয় দিনের মধ্যে অন্যতম হলো ভারতমাতা পূজন দিবস। গত ২৬ জানুয়ারি সংগঠনের পক্ষ থেকে গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন স্থানে ভারতমাতার পূজন করা হয়। পতাকা উত্তোলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতি রেখে পূজন করা হয়।

কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক আশিস সরকার ভারতমাতা কেন আমাদের আরাধ্য তা উল্লেখ করে বলেন, কৃষক দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, তাই তার ন্যায্য দাবিও আদায়ে কিষাণ সঙ্ঘ বদ্ধপরিকর। ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষকের ন্যায্য দাবি সরকারের কাছ থেকে আদায় করতে কাজ করে চলেছে। ভারতমাতা আমাদের এই কাজে সহায় হবেন।

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন

১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি প্রয়াত হন এশিয়ার মুক্তিসূর্য, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। তাঁর ৮১তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে গত ২১ জানুয়ারি কলকাতার মহাজাতি সদনে রাসবিহারী বসু রিসার্চ ব্যুরো, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি এবং দেশবরেণ্য বিপ্লবীদের পরিবারের উদ্যোগে রাসবিহারী বসু এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানকে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ভাইঝি ইন্দ্রাণী বসু ও নাতি পার্থসারথি বসু, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)-এর পৌত্র ইন্দুজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. শিশুতোষ সামন্ত, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস, বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাতি অমল মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সম্পাদক প্রদীপ দত্ত, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নেতাজী গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী, রাসবিহারী বসু রিসার্চ ব্যুরোর সম্পাদক তপন ভট্টাচার্য, অশোকনাথ শাস্ত্রী-গৌরীনাথ শাস্ত্রী স্মারক সমিতির সহ-সভাপতি তিমির রঞ্জন হালদার, বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা স্মারক কমিটির সম্পাদক সুবীর সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আন্দামান সেলুলার জেলে ১৪ বছর কাটানো বিপ্লবী কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর নাতনি কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের পরিবারের সদস্য সুদীপ বিশ্বাস ও সুতপা বিশ্বাস, বিপ্লবী যতীন দাস স্মৃতি সমিতির সম্পাদক সুবীর কুমার কুণ্ডু, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা অরবিন্দ সরকার প্রমুখ। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও বসন্ত বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে তাঁরা মালা ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে বিপ্লবী রাসবিহারীকে স্মরণ করেন ড. জয়ন্ত চৌধুরী। বিপ্লবীদের পরিবার এবং অগণিত দেশপ্রেমিকদের পক্ষে তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতি তিনটি দাবি তুলে ধরেন। ১৮৮৬ সালের ২৫ মে দেশবরেণ্য বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মদিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানান তিনি। বিদ্যালয়স্তরে ইতিহাস বিষয়ের পাঠ্যক্রমে বিপ্লবী মহানায়কের সংগ্রামী জীবনের অন্তর্ভুক্তি, তাঁর মহাজীবনের যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে তাঁকে 'মরণোত্তর ভারতরত্ন' স্বীকৃতিদানের দাবিটিও তিনি উত্থাপন করেন। দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনান চন্দ্রাণী কর্মকার, ধ্রুব হালদার প্রমুখ সংগীতশিল্পী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তরুণ বিশ্বাস।

মথুরাবাটী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির উদ্যোগে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের খাতা-কলম বিতরণ

হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়ার মথুরাবাটী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের

মাধ্যমে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের খাতা-কলম বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের স্বামী মাতৃরূপানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে মথুরাবাটী ও সাতগড়া গ্রামের ৩১৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে খাতা, কলম বিতরণ করা হয়। গ্রাম নেশা মুক্ত, শিক্ষা যুক্ত, সংস্কার যুক্ত করতেই সারা বছর বিভিন্ন সেবা কর্মসূচি নেওয়া হয়, তারই অন্তর্গত এই উদ্যোগ।

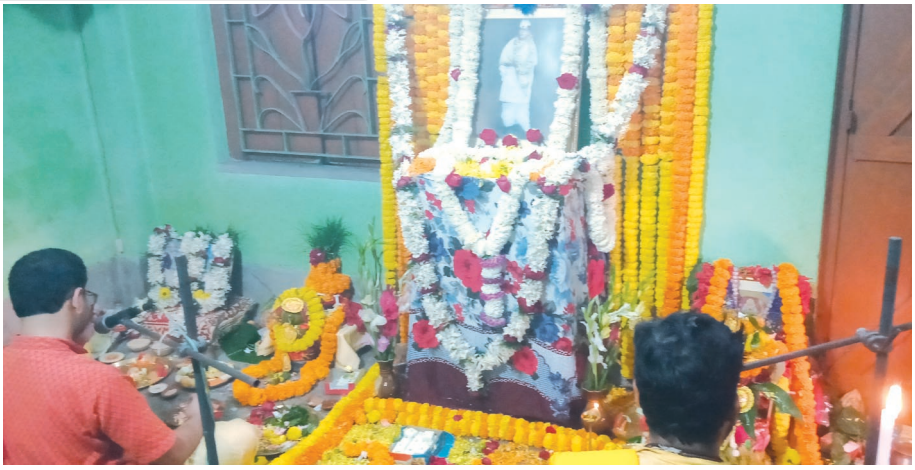

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা করে যজ্ঞ

মধ্য কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করতেন বিপ্লবী শিবপ্রসাদ নাগ। ছাত্রদের কাছে তিনি 'মাস্টারমশাই' নামে পরিচিত ছিলেন। জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিকদের কাছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এক মৃত্যুহীন প্রাণ। ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তাঁর ছাত্রদের নিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা করে একটি যজ্ঞানুষ্ঠানের সূচনা করেন নেতাজী-অন্তঃপ্রাণ মাস্টারমশাই। পরবর্তীকালে তিনি সোদপুর চন্দ্রচূড় বিদ্যাপীঠে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। প্রতি বছর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে তাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে নেতাজী জয়ন্তী উদ্‌যাপন। তাঁর মৃত্যুর পর সোদপুরের মহেন্দ্রনগরে তাঁর ছাত্র ডাঃ নিতাই চন্দ্র বিশ্বাসের উদ্যোগে প্রতি বছর হয়ে চলেছে এই যজ্ঞানুষ্ঠান। অন্যান্য বছরের মতো, গত ২৩ জানুয়ারি তাঁর বাসভবনে আয়োজিত হয় বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘজীবন প্রার্থনায় হোমযজ্ঞ। পূজা ও যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন সর্বেশ্বর চক্রবর্তী, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুমন ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিচারক শান্তনু রায়-সহ সুকান্ত বিশ্বাস, পশুপতি রায়, ডাঃ বিজয়কেতন মুখোপাধ্যায়, মানস অধিকারী, শিবাজী ভট্টাচার্য, স্বপন কুণ্ডু, মলয় বিশ্বাস, প্রবীর বিশ্বাস, পুলক সরকার, সমর সরকার, বাবলু দেবরায়, দুলাল দাশ, কাজল দে, সৌভিক দে, সেন্টু দত্ত প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সঞ্জয় বণিক, মনোজিৎ দাশ, সুদেষ্ণা দে, অশোক ঘোষ, সাপ্তাহিক স্বস্তিকার পক্ষে অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় এবং চিত্র সাংবাদিক শ্যামল কর। ১২টা ৪২ মিনিটে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মমুহূর্তে শঙ্খধ্বনি করা হয়। পূর্ণাহুতির পর যজ্ঞ সমাপ্ত হলে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আতশবাজি পোড়ানো -সহ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ১২৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে নেতাজী অনুগামীরা ১২৯টি মোমবাতি প্রজ্বলন করেন। বিশ্বজুড়ে আজ ঘনিয়ে উঠছে নানা সংকট। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ ও উদ্ধারকল্পে সকলে তাঁর আশীর্বাদ ও পুনরাবির্ভাব প্রার্থনা করেন।

দৈবকী দেবী সারদা শিশু নিকেতনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ২৬ জানুয়ারি মালদা জেলার গাজোলে হরিপুর ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো দৈবকী দেবী সারদা শিশু নিকেতনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর মালদা জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি রামপ্রসাদ সরকার, সহ সভাপতি আশারু সরকার।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য এবং দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এর পর শিশুদের বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যের পর রাষ্ট্র বন্দনা গাওয়া হয়। পতাকা অবতরণের পর প্রধান আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ফঃ ৪

ঐকতান সভাকক্ষে জাতীয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান এবং লেখক সম্মেলন

গত ২৭ জানুয়ারি বই বন্ধু পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা এবং আমি ভারত বলছি ট্রাস্ট, কোচবিহারের যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় বিধাননগর-স্থিত পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের ঐকতান সভাকক্ষে আয়োজিত হয় জাতীয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান এবং লেখক সম্মেলন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের পূর্বতন রাজ্যপাল তথাগত রায়, রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণী সদস্য ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সাধন কুমার পাল, আইনজীবী ও সমাজকর্মী প্রসূন মৈত্র এবং বিশিষ্ট লেখক সন্দীপ মুখোপাধ্যায়। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঋষি অরবিন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার প্রাসঙ্গিকতা'। সম্মেলনে ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ও সাধন কুমার পালকে উপরোক্ত সংস্থাদ্বয়ের দ্বারা 'ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট' সম্মানে ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কুশলবরণ চক্রবর্তীকে 'ঋষি অরবিন্দ আইকনিক ফিগার অফ দ্য ইয়ার, ২০২৫' এবং ড. কল্পনা মল্লিককে 'ভগিনী নিবেদিতা মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড' সম্মান প্রদান করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা প্রসূন মৈত্র রচিত 'ওয়াকফের করাল গ্রাস' ও 'ফিয়ার্স ক্লাচেস অফ ওয়াকফ'-শীর্ষক দু'টি পুস্তক, দেবজ্যোতি চক্রবর্তী রচিত 'সরাইঘাটের সিংহ' ও 'চাড্ডি'-শীর্ষক দু'টি পুস্তক এবং নোয়াখালী গণহত্যার উপর ইংরেজি ভাষায় রতন ঘোষ রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ—'1946 Genocide',অর্থাৎ মোট পাঁচটি পুস্তকের আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিআইপিবুক্স ডট কমের প্রধান সম্পাদক দেবজ্যোতি চক্রবর্তী।

দত্তপুকুরে শ্রীরামমন্দিরে বাৎসরিক পূজা

২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি, পবিত্র কূর্মদ্বাদশী তিথিতে অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে নির্মিত ভব্য রামমন্দিরের উদ্‌ঘাটন এবং ভগবান শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার মহতী অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। এই বছর গত ১১ জানুয়ারি দিনটিতে ছিল কূর্মদ্বাদশী তিথি। এই দিনটিতে অযোধ্যায় শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার বাৎসরিক অনুষ্ঠানটি জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দত্তপুকুর জয়পুল শ্রীরামমন্দিরও ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় দায়বদ্ধ।

গত ২২ জানুয়ারি দত্তপুকুর জয়পুল শ্রীরামমন্দিরে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বাৎসরিক পূজার আয়োজন করা হয়। সকাল ৮টায় অধিবাস, পূজার শুভারম্ভ হয় সকাল ১০টায়। দুপুর ১টা থেকে শুরু হয় মহাযজ্ঞ ও নবগ্রহ যজ্ঞ। দুপুর ৩টায় প্রসাদ বিতরণ শুরু হয়। বিকাল ৪টায় শুরু হয় নাম সংকীর্তন। সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠিত হয় রাম দরবারে রাম রাজা যাত্রাপালা। পরের দিন, গত ২৩ জানুয়ারি সকাল ৮টায় ভগবান শ্রীরামের পূজার সূচনা হয়। সকাল ১০টায় শুরু হয় অঙ্কন প্রতিযোগিতা। বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হয় ইসকন হরেকৃষ্ণ নাম হট্ট।

‘অমৃত আলোয় ভারতের সংবিধান’ শিরোনামে সংস্কার ভারতীর ভারতমাতা পূজন

গত ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস এবং সংবিধান রচনার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত দ্বারা ‘অমৃত আলোয় ভারতের সংবিধান’ শিরোনামে আয়োজিত হয় ভারতমাতা পূজন। প্রান্তের প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন চর্চাকেন্দ্রের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে সারাদিন ব্যাপী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করেন ভারতমাতা পূজা।

এদিন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ২১টি স্থানে ভারতমাতার পূজা হয়। ধ্যেয়গীত, দীপমন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে প্রদীপ প্রজ্বলন, ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হয়। সংস্থার সদস্যরাই অমৃত বচন, সুভাষিত, দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। উত্তর কলকাতার বাগুইহাটি, দেশবন্ধুনগর, উত্তর কলকাতা, দক্ষিণেশ্বরের পাশাপাশি দক্ষিণ কলকাতার বেহালা ও ঢাকুরিয়া চর্চাকেন্দ্র, হাওড়ার শিবপুর, নদীয়া জেলার নবদ্বীপ চর্চাকেন্দ্র, হাওড়া গ্রামীণের আমতা বীরেশ্বর বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, বর্ধমান জেলায় বিবেকানন্দ শিশু মন্দির, হুগলির চুঁচুড়ার বঙ্কিম ঘাট, মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার চড়কতলা, সোনারপুর, সোনারপুর গ্রামীণ ও গোচারণ চর্চাকেন্দ্র, বীরভুমের সিউড়ি, উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙ্গা-সহ আরও বহু জায়গায় পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালন করা হয়। সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, কেবল অনুষ্ঠানের আয়োজন নয়, ললিতকলা ও সাহিত্যে সমর্পিত অখিল ভারতীয় সংস্থা সংস্কার ভারতীর মূল লক্ষ্য এক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত একত্রীকরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশমাতৃকার প্রতি দেশবাসীর মৌলিক কর্তব্য ও তার প্রতি একনিষ্ঠ সাধনা সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ও শোভাযাত্রা

অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভব্য মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২২ জানুয়ারি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, উত্তর কলকাতা জেলার কাশীপুর প্রখণ্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পূজা এবং একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা । শোভাযাত্রা শুরুর আগে উত্তর কলকাতার চিড়িয়ামোড় ট্রাফিক বুথের সামনে পরিষদের কার্যকর্তাদের এবং রামভক্তদের জমায়েত হয়। এরপর শোভাযাত্রাটি চিড়িয়ামোড়-কাশীপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, চুনীবাবু বাজার, পাইকপাড়া-কৃষ্ণ টাওয়ার, বিটি রোড-লকগেট রোড, লালাবাবু লেন শিবমন্দির হয়ে কাশীপুর-স্থিত লালাবাবু লেনে জ্যোতিষ তন্ত্র কার্যালয়ের কাছে শেষ হয়। এরপর জ্যোতিষতন্ত্র কার্যালয়ের বামদিকের লেনে পূজারি পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পূজা। শ্রীভগবানের আরতির পর তাঁর পূজা শেষে উপস্থিত সকল ভক্তসমূহকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতীর উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

গত ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে কলকাতার হাতিয়াড়ায় ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী এবং সাবিত্রীদেবী কাজারিয়া সরস্বতী শিশু মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে এবং বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হলো স্বাস্থ্য শিবির। সকাল ১০টায় সরস্বতী শিশু মন্দিরে ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মধ্যে শিবিরের শুভারম্ভ হয়। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সহ সেবা প্রমুখ রাজকুমার মটালে। শিবিরে চক্ষু পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি-সহ আরও বিভিন্ন পরীক্ষার পাশাপাশি আয়ুর্বেদ চিকিৎসাও করানো হয়। ৬ জন চিকিৎসক ৭ জন সহযোগীর মাধ্যমে শিবিরে ১৪০ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

গোবরডাঙ্গায় সংস্কার ভারতীর চিরন্তন নাট্য উৎসব

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙায় আয়োজিত হলো সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ৯ম চিরন্তন নাট্য উৎসব। গত ১৭ জানুয়ারি গোবরডাঙা টাউন হল এবং চিরন্তন কলা কেন্দ্রে উৎসবের উদ্‌ঘাটনে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা পৌরসভার চেয়ারম্যান শঙ্কর দত্ত, শিল্পায়ণের কর্ণধার আশিস চ্যাটার্জি, নকশার কর্ণধার আশিস দাস, অভিনেতা গৌতম মুখার্জি এবং সংস্কার ভারতীর জেলা সভানেত্রী শাশ্বতী নাথ এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত নাট্য টোলির সদস্য স্বপ্না ব্যানার্জি।

উৎসবের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে চারটি করে মোট আটটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। অন্তিম দিনে আরও দুটি নাটক পরিবেশিত হয়। শেষদিনের অনুষ্ঠানে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র রচনার প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান নাট্যজগতের ভাবনা বিষয়ে ছিল আলোচনা। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক প্রশান্ত দে, নাট্য পরিচালক জীবন চট্টোপাধ্যায় এবং গৌড়ীয় নৃত্যশিল্পী জয়ন্ত বিশ্বাস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নাট্য পরিচালক জীবন অধিকারী।

উৎসবে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খ্যাতনামা নাট্যদল তাদের উৎকৃষ্ট নাটক পরিবেশন করেন। নাটকের মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানান বিষয় উপস্থাপনের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধকে সামনে আনার চেষ্টা করা হয়।

বিখ্যাত নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা মনোজ মিত্র, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এবং চিরন্তনের সদস্যা রিমা মুখার্জির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবারের উৎসব তাঁদের নামে উৎসর্গ করা হয়।

চিরন্তন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের অংশগ্রহণকারী দলগুলি হলো শৌভিক সাংস্কৃতিক চক্র, কথাকৃতি, ঢাকুরিয়া নাট্যমুখ, দমদম শিল্পাঙ্গন, শ্যামবাজার নাট্য কাব্য, খড়দহ থিয়েটার জোন, ড্রাফার পারফর্মিং গ্রুপ ও রংরূপ বিহার। অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে অভিনেতা, নাট্যকার, পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও দর্শকের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন গোবরডাঙা চিরন্তনের পরিচালক অজয় দাস।

সন্ন্যাসী ও সংসারী

যুগাচার্য—ভারতকেশরী : সঙ্গ প্রসঙ্গ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সাধক তাঁরা। প্রেমিক তাঁরা। জীবনপথের পথিক তাঁরা— নবদিগন্তের দিশারী। দ্বৈত তাঁরা— আবার অদ্বৈতও। একজন সন্ন্যাসী, অন্যজন সংসারী। বিচরণ ক্ষেত্র তাঁদের ভিন্ন। আবার লক্ষ্যে তাঁরা একই অর্ণব-গামী। তাঁরা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। একজন যুগাচার্য, অন্যজন ভারতকেশরী।

বহিরঙ্গে এই দুই ব্যক্তিত্বের পার্থক্যটা বিরাট তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও অন্তরঙ্গে দুজনেই যেন বড়ো ঘনিষ্ঠ— বড়ো কাছাকাছি। দু'জনই ভারত তথা মানব কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ। জাতীয়তাবোধ আর স্বধর্মনিষ্ঠায় দু'জনেই যেন অচল হিমালয়। আপাতদৃষ্টে ভিন্ন পথচারী এই দুই বঙ্গসন্তান আপন সাধনায় রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে দেশ কেন, বিশ্বের বহু প্রান্তের মানুষের প্রেরণা ও স্বজন। স্মরণীয় অবশ্যই সকলের।

এক অর্থে দু'জনেই কর্মযোগী। দু'জনেরই জীবনকাল সে অর্থে মোটেই দীর্ঘ নয়। প্রণবানন্দজী (১৮৯৬-১৯৪১) ৪৫ বছর বয়সে আর শ্যামাপ্রসাদ (১৯০১-১৯৫৩) ৫২ বছর বয়সে পার্থিব জগতের সব কর্মকাণ্ড শেষ করে বিদায় জানান এই মর্ত্যধামকে। আদি শঙ্করাচার্য-শ্রীচৈতন্য-বিবেকানন্দের মতোই স্বল্পায়ু ওই দুই মহানায়ক তাঁদের কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে যে বিরাট সৌধ গড়েন— সবিস্ময়ে সকলে আজও দেখে তা ঊর্ধ্বমুখে। প্রণবানন্দজী মহারাজ আবির্ভূত হয়েছিলেন পদ্মাপাড়ে বর্তমান বাংলাদেশে ফরিদপুরের বাজিতপুর গ্রামে। অন্যদিকে শ্যামাপ্রসাদের জন্ম গঙ্গাপাড়ে এই মহানগর কলকাতায়। দু'জনেরই জন্ম সচ্ছল পরিবারে। অথচ দু'জনেই বেছে নিয়েছিলেন এক সংগ্রামী কৃচ্ছ্রজীবন— স্বেচ্ছায় অথবা ঐশী নির্দেশে। সময়ের দিক থেকে প্রণবানন্দজী অগ্রজ। শ্যামাপ্রসাদের চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো। অন্যদিকে এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি শ্যামাপ্রসাদের চেয়ে এক যুগ বা বারো বছর আগে।

প্রাথমিকভাবে দুই ভিন্ন পরিবেশে তাঁদের বেড়ে ওঠা। কর্মজগতের পরিধিও আলাদা। প্রায় সমান্তরাল দূরত্বে বয়ে গেছে দু'জনের জীবন প্রবাহ। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে দুই প্রবাহ এক সময় মিলেছে এক জায়গায়, রচিত হয়েছে দ্বিবেণী। আরও আশ্চর্য, একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রণবানন্দজী তাঁর লক্ষ্য ও কর্মের একটি ধারার উত্তরসাধক হিসেবে নির্বাচিত করে যান শ্যামাপ্রসাদকে। বস্তুত যে সময় হয় প্রণবানন্দজীর জীবনাবসান— প্রায় সে সময় থেকেই তাঁর উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের পথচারী হলেন শ্যামাপ্রসাদ। বাঙ্গালি হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা এবং হিন্দু-নবজাগরণের চিন্তাকে সর্বব্যাপ্ত করার যে হোমাগ্নি জ্বেলেছিলেন প্রণবানন্দজী, তাকে অনির্বাণ করার জন্য এগিয়ে এলেন শ্যামাপ্রসাদ। শিক্ষার অঙ্গন ছেড়ে রাজনীতির প্রাঙ্গণে আরও দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এলেন শ্যামাপ্রসাদ। এলেন নিজের অন্তরের নির্দেশে। এহেন প্রণবানন্দজী পরোক্ষে তাঁর হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছিলেন স্বধর্ম পালন ও রক্ষায় ইচ্ছাব্রতী হওয়ার যে দীপশিখা— তারই এক উজ্জ্বল প্রেরণায়।

হিন্দুজাগরণ, হিন্দুর স্বার্থ সংরক্ষণ এবং হিন্দুধর্ম প্রবর্ধনের যে নীতি ঘোষণা করেন স্বামী প্রণবানন্দ, সেই নীতিই হলো শ্যামাপ্রসাদেরও জীবনবেদ। প্রাচীন গুরু-শিষ্য পরম্পরার পথেই এগিয়ে চলেন তিনি অনুগতজনের মতোই। সনাতন ধারায় শ্যামাপ্রসাদের গুরুকরণ হয়েছিল তা কিন্তু নয়। মন্ত্র না নিলেও শ্যামাপ্রসাদ যে প্রণবানন্দজীর আদর্শেই দীক্ষিত হয়েছিলেন— তিনিই যে তাঁকে বিশেষভাবে প্রাণিত করেছিলেন সে কথা আক্ষরিকভাবেই স্বীকার করেছেন শ্যামাপ্রসাদ।

স্বামী প্রণবানন্দজীকে প্রণতি জানিয়ে শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন, 'আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, তিনি আমার প্রথম রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ প্রেরণাশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। আজও আমি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি এই বিরাট পুরুষের সুমহান ব্যক্তিত্ব, গভীর অন্তর্দৃষ্টি তেজব্যঞ্জক পৌরুষ ও আধ্যাত্মিক শক্তির কথা।' (স্বামী আত্মানন্দ সম্পাদিত মনীষীদের দৃষ্টিতে আদর্শ ঋষি প্রণবানন্দ)।

শ্যামাপ্রসাদের কথায় তাঁর 'প্রথম রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ প্রেরণাশক্তি সঞ্চার করেন প্রণবানন্দজী। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কবে তাঁদের প্রথম দেখা অথবা শ্যামাপ্রসাদ প্রথম কবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে আসেন। এসবের ঐতিহাসিক কোনো তথ্য তেমনভাবে পাওয়া যায় না। কিছু অনুমান এবং সামান্য কিছু তথ্যের ভিত্তিতে বলতে হয়।

ড. শ্যামাপ্রসাদ প্রথম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে আসেন ১৯৪০-এর ২৫ আগস্ট রবিবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায়। তথ্যটি পাওয়া যায় স্বামী বেদানন্দ-র 'শ্রীশ্রী যুগাচার্য জীবন চরিত' বইটিতে। এটাই যদি উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সে সাক্ষাতের পর মাত্র ১৩৭ দিন মরদেহে ছিলেন স্বামী প্রণবানন্দজী। ওই তথ্য অনুযায়ী এরপর মাত্র একবারই দেখা হয়েছিল দু'জনের। অবশ্য শ্যামাপ্রসাদ নিজে বলেছেন, 'স্বামীজী মহারাজের সহিত বহুবার আমার আলাপের সুযোগ ঘটিয়েছিল। কয়েকবার আমি তাঁহার আহ্বানে বালিগঞ্জে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সম্মেলনে জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রির সময় বক্তৃতা ও সভাপতিত্ব করিয়াছি।' (মনীষীদের দৃষ্টিতে স্বামী প্রণবানন্দ)। এই তথ্য অনুযায়ী জন্মাষ্টমীর সভা নয়, তার আগেই প্রণবানন্দ-শ্যামাপ্রসাদ সাক্ষাৎকার হয়েছিল। অবশ্য তাও খুব বেশিদিনের ব্যাপার নয়। তাহলে কীভাবে শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক জীবনের প্রেরণা হলেন প্রণবানন্দজী?

এ ধরনের তথ্যের আলোয় সিদ্ধান্তে আসা যায়, শ্যামাপ্রসাদ যে দিনই প্রথম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে আসুন না কেন স্বামী প্রণবানন্দজীর কথা তিনি জানতেন আগে থেকেই। দেখাও হয়েছিল সম্ভবত জন্মাষ্টমীর ওই সম্মেলনের বেশ কিছু আগে।

সেটাই স্বাভাবিক। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ১৯১৭-তে ফরিদপুরের বাজিতপুরে প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রথম থেকেই তার একটি দপ্তর ছিল কলকাতায়। প্রথম দিকে উত্তর ও মধ্য কলকাতার নানা জায়গায় সঙ্ঘের কলকাতা কার্যালয়ের কাজ চলত ভাড়া বাড়িতে। সে সময় সঙ্ঘের বেশিরভাগ ত্রাণ ও সেবাকাজ খুলনা ও সন্নিহিত সুন্দরবন অঞ্চলে চললেও তার খবরাখবর কলকাতাতেও প্রচারিত হতো। ওই সময়ই গয়ায় তীর্থসংস্কারে স্বামী প্রণবানন্দজী যে ভূমিকা নেন, তাতে সারা দেশই সঙ্ঘ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কলকাতার বিভিন্ন দৈনিকে সঙ্ঘ সম্পর্কে যেসব খবরাখবর প্রকাশিত হতো, তাতেও শহরের মানুষের কাছে সঙ্ঘ একটি পরিচিত নাম হয়ে ওঠে।

সঙ্ঘের প্রচার শাখা চারণ দল শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছোটো ছোটো সভা করে ও নগর-সংগীতের মাধ্যমে শহর পরিক্রমা করে কেবল সাধারণ মানুষ নয়, শিক্ষিত এবং অভিজাত শ্রেণীকেও সঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। ১৯৩২-এ বালিগঞ্জে সঙ্ঘের নিজস্ব ভবন গড়ে ওঠার পর শহরের মানুষের সঙ্গে ভারত সেবাশ্রমের সম্পর্কটা আরও দৃঢ় হয়।

একইসঙ্গে দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হিন্দু জাগরণ কর্মসূচিতে নিয়মিত সভা-সমিতির মাধ্যমে জনমত সংগঠনে সঙ্ঘ যেরকম সক্রিয় ভূমিকা নেয় তাতে নাগরিক সমাজও সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত হতে থাকে। তখন থেকেই সঙ্ঘ এবং স্বামী প্রণবানন্দজী সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের আগ্রহ দেখা দেয়।

শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতিতে আসাটা হয়তো পূর্বনির্ধারিতই ছিল। নাহলে তাঁর জীবন তো বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইন জগৎকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হওয়ার কথা। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বাইশ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে বাংলায় এমএ পাশের পরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সদস্য হন তিনি।

১৯২৪-এ আইনে স্নাতক হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। দু' বছর বাদে তিনি বিলেতে যান ব্যারিস্টারি পড়তে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ব্যারিস্টার হয়ে তিনি দেশে ফেরেন। শুরু হয় ব্যারিস্টারি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের অধ্যাপনা। সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত হন শ্যামাপ্রসাদ।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দেই শ্যামাপ্রসাদের জীবন রাজনীতির দিকে মোড় নেয়। ওই বছরেই তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে পরিষদীয় কাউন্সিলে নির্বাচিত হন। পরের বছর কংগ্রেস কাউন্সিল বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। কিন্তু কংগ্রেসের ওই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারেন না শ্যামাপ্রসাদ। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের কথা ভেবে তিনি নির্দল সদস্য হিসেবে কাউন্সিলে আবার নির্বাচিত হন। কার্যত, তখন থেকেই শুরু হয় শ্যামাপ্রসাদের বর্ণময় রাজনৈতিক জীবনের যাত্রা। গতানুগতিক পথে না চলে নিজস্ব বিচার বিবেচনা বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ হয়ে ওঠেন ভারত-রাজনীতির এক যুগপুরুষ।

এদিকে তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা, কংগ্রেস নেতাদের কোলাহল চিত্ততা, মুসলিম লিগের একরোখা আগ্রাসী মনোভাব, ইংরেজ সরকারের বিভেদমূলক কুচক্রান্ত এবং সাম্প্রদায়িকতার আগুনে ইন্ধন জোগানো ক্রমেই চঞ্চল করে তুলছিল স্বামী প্রণবানন্দজীকে। তিনি বুঝতে পারছিলেন হিন্দুর স্বার্থর দিকে কার্যত কংগ্রেস নেতৃত্বের কারও নজর নেই। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রর প্রতিও আস্থাশীল হতে পারেননি তিনি। চলমান ঘটনাই সেসময় তাঁকে শ্যামাপ্রসাদের প্রতি নজর দিতে যেন কিছুটা বাধ্যই করে। তিনি শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে দেখতে পান এক ধরনের ব্যতিক্রমী বিচারবোধ। সিদ্ধান্তে আসেন, বাঙ্গালি হিন্দুর স্বার্থরক্ষায়, তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদই দিতে পারবেন যোগ্য নেতৃত্ব। তাই শুরু হয় তাঁর

শ্যামাপ্রসাদকে অভিষিক্ত করার এক নিভৃত প্রয়াস।

হিন্দু মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু জাগরণে নানা সভা সমিতির আয়োজন করলেও প্রণবানন্দজী মহারাজ অনুভব করেন তাঁর এ মর্ত্যলীলাবসানের বাঁশরী বেজে চলেছে অতিনিকটে। আর বোধহয় সে কারণেই শ্যামাপ্রসাদের প্রতি তাঁর আগ্রহ তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৪০-এ জন্মাষ্টমীর সভায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁকে আসার জন্য সন্তানদের পাঠাতেও থাকেন। পাঁচ পাঁচবার শ্যামাপ্রসাদ আসার কথা দিয়েও হিন্দু মহাসভার নানা কাজের চাপে কথা রাখতে পারেননি। পঞ্চমবারে তিনি এর জন্য গভীর লজ্জা প্রকাশ করে জন্মাষ্টমীর সভায় অবশ্যই আসার এবং দেখা করার কথা দেন। বাস্তবে হয়ও তাই।

সেদিনের অর্থাৎ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ১৯৪০-এর ২৫ আগস্ট রবিবার বিকেলের সেই সভার প্রায় ধারাবিবরণী পাওয়া যায় স্বামী বেদানন্দজীর ওই বইটিতে। বিবরণী অনুযায়ী, বেলা ৫টায় প্রণবানন্দজী সম্মেলন মণ্ডপের প্রবেশ মুখে কলকাতার রাসবিহারী এভিনিউতে একটি মোটরে বসে আছেন। শ্যামাপ্রসাদ আসার পরই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সভায় এলেন প্রণবানন্দজী মহারাজ। মঞ্চে উঠে তিনি নিজের গলার মালাটি খুলে পরিয়ে দিলেন শ্যামাপ্রসাদের গলায়। তাঁকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ জানিয়ে মঞ্চে বসলেন তিনি।

যথারীতি শেষ হলো সভা। বিদায় নিলেন শ্যামাপ্রসাদ। প্রণবানন্দজীও ফিরে এলেন নিজের ঘরে। বেদানন্দজী তাঁর জামাটা যখন খুলছেন, সেই সময় অদ্ভুত এক শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলে ওঠেন প্রণবানন্দজী— 'বাঙ্গালি হিন্দুর সামনে দাঁড়াবার লোক ঠিক করে দিলাম।'

বেদানন্দজী লিখছেন, সেদিন তাঁর ওই কথার যথার্থ মর্মার্থ তিনি বুঝতে পারেননি। শুধু বুঝেছেন, 'কুচক্রী মুসলিম লিগ মন্ত্রীমণ্ডলীর ষড়যন্ত্রে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের হিন্দু সমাজ নানভাবে উৎপীড়িত ও নির্যাতিত হইতেছে, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ নীরব দর্শক। একমাত্র শ্যামাপ্রসাদই সদলবলে উৎপীড়িত হিন্দুর রক্ষার্থে প্রাণপাত করিতেছেন। সঙ্ঘনেতা আচার্য নানাভাবে তখন হিন্দু-মহাসভা তথা শ্যামাপ্রসাদের হিন্দু সংরক্ষণ প্রচেষ্টা সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং শ্যামাপ্রসাদকে তিনি আশীর্বাদ ও শক্তিদানপূর্বক সহায়তা করিলেন।'

প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের নীতিতে বিরক্ত হয়েই ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। ১৯৪০-এ তিনি হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি হন। তাঁর এই রাজনৈতিক উত্তরণেই প্রণবানন্দজী মহারাজ আশান্বিত হয়ে তাঁকেই হিন্দু স্বার্থরক্ষণের সার্থক নির্ভরযোগ্য নেতা হিসেবে শ্যামপ্রসাদকে মনোনীত করেন।

নিজের গলার মালা দিয়েছিলেন যাঁর গলায়, তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রণবানন্দজী মহারাজ যেন বড়ো বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। দেশের পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি যদি তাঁর উদ্বেগের একটি কারণ হয়, তবে অন্য কারণ, নিজের বিদায় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া। প্রণবানন্দজী মহারাজ জানতেন, তাঁর হাতে আর খুব বেশি সময় নেই। তাই যাঁকে তিনি বাঙ্গালি হিন্দুর ভবিষ্যৎ রক্ষক মনে করেছিলেন, তাঁর মধ্যে সবরকম শক্তি সঞ্চার করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছোতেই শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর আবার সাক্ষাৎ হলো ওই ২৫ আগস্টের ৪৪ দিনের মাথায়।

সেবার দুর্গাপূজা ও হিন্দু সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রণবানন্দজী মহারাজ এলেন বারাণসীর আশ্রমে। সে সময় তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছিল কেমন যেন এক ধরনের অস্থিরতা। সেই অস্থিরতার মুহূর্তে তিনি তাঁর সন্তানদের বললেন, শ্যামাপ্রসাদের কাছে যাও, বলো আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কিন্তু তিনি কী এখন বারাণসীতে আছেন?

—যাও না, খুঁজে দেখো, নিশ্চয় পাবে তাঁকে।

আর কোনো কথা না বলে সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা বেরিয়ে পড়েন। এবং একটু খোঁজ করতেই তাঁরা জানতে পারেন, শ্যামাপ্রসাদ বারাণসীতে এসেছেন। সপরিবারে রয়েছেন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। খবর পেয়েই তাঁরা গেলেন সেখানে। শ্যামাপ্রসাদকে বললেন, স্বামীজী মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন। একবার চলুন আমাদের আশ্রমে।

শ্যামাপ্রসাদ বলেন, তিনি যখন বলেছেন, নিশ্চয় যাবো। তবে আজ নয়। যাবো মহাষ্টমীর দিন। সকালে গিয়ে মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবো। স্বামীজী মহারাজকেও দর্শন করবো; আশীর্বাদ নেবো।

কথামতোই শ্যামাপ্রসাদ পরিবারের সকলকে নিয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বারাণসী আশ্রমে এলেন। দিনটা ছিল ১৯৪০-এর আট অক্টোবর, মঙ্গলবার।

সেদিন প্রায় বদ্ধ ঘরে মিলিত হলেন প্রণবানন্দজী ও শ্যামাপ্রসাদ। একান্তে কথা হলো দু'জনের। কী নিয়ে আলোচনা হলো তাঁদের সেই মুহূর্তে তাঁরা ছাড়া আর কেউ জানল না তা। পরে অবশ্য শোনা গেল তাঁর কথা। মুখমণ্ডলে তখন আশ্চর্য নিশ্চিন্তির এক ভাব। বিবেকানন্দের মধ্যে সব শক্তি সঞ্চার করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, আজ আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম। স্বামী প্রণবানন্দর কণ্ঠে অবশ্য ছিল ভিন্ন সুর— সে সুর নির্ভরতার, পরম আস্থার। তাঁর কথায় ছিল একজন যোগ্য দেশনায়ক, বাঙ্গালি হিন্দুর একজন উপযুক্ত রক্ষাকর্তার সন্ধান পাওয়ার পরিতৃপ্তি।

আচার্য প্রণবানন্দ মহারাজ সেদিন যা বলেছিলেন তার সারকথা— 'বাঙ্গালি জাতির সামনে দাঁড়ানোর একটা লোক ঠিক করে দিয়ে গেলাম। আবার আমার ভাব যে শ্যামাপ্রসাদই কিছুটা বুঝেছেন।'

কী তাঁর ভাব? কী মনের ভাব— 'আত্মরক্ষাই প্রত্যেক জীবের, প্রত্যেক মানুষের স্বধর্ম— আত্মরক্ষার উদ্যম ও সামর্থ্য যার নেই। কোনো ন্যায়বোধের অনুশাসন, যুক্তিতর্কের ধর্ম, মানুষ্যত্বের আবেদন তাকে কদাচ রক্ষা করতে পারে না। শক্তি সংগ্রহের উপায় সঙ্ঘবদ্ধতা।'

স্বামী প্রণবানন্দজীর কথা, হিন্দু জাতি শান্তিপ্রিয়, উদার, নিরর্থক কারও ধন,

সম্মান, স্বার্থে আঘাত দেওয়া তার স্বভাব নয়। অন্যকে বঞ্চনা করে অন্যায় অধিকার সে চায় না। এটা ভীরুতা নয়, এটা জাতির সহিষ্ণুতা। তাবলে অন্যায়-অত্যাচার সে সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। অন্যায়ের প্রতিকারে ফোঁস করার যে কথা একদা শুনিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তারই প্রতিধ্বনি স্বামী প্রণবানন্দেরও কণ্ঠে— এক হতে হবে, সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, জাতির প্রতি অবিচারের প্রতিকারে উচ্চশির হতে হবে!

প্রণবানন্দজী মহারাজের এসব কথার সঙ্গে সহমর্মিতা অনুভব করতেন ড. শ্যামাপ্রসাদও। তাই বঙ্গের বরিষ্ঠ নেতারাও যখন বাঙ্গালি হিন্দুর প্রতি অত্যাচার-অন্যায়ের ঘটনাকে এড়িয়ে যেতে ব্যস্ত সেসময় এগিয়ে এলেন শ্যামাপ্রসাদ। শিক্ষক এবার অবতীর্ণ হলেন রক্ষাকর্তার ভূমিকায়। তাঁর সেই ভূমিকায় স্বামী প্রণবানন্দজী হলেন শক্তিসঞ্চারক।

মানব কল্যাণে, হিন্দুর স্বার্থ সংরক্ষণে প্রণবানন্দজী মহারাজ যে কর্মযজ্ঞের সূচনা করেন তার তাৎপর্য সেই সময় সকলে যে বুঝেছিলেন তা নয়। সেটাই স্বাভাবিক কারণ, 'যুগস্রষ্টা বা যুগপ্রবর্তক মহান আচার্যরা শুধু তাঁহাদের স্বল্পস্থায়ী জীবৎকালের (সমস্যাসমূহের সমাধানের) জন্যই কর্ম করেন না, তাঁহারা কর্ম করেন অনাগত সুদূর ভবিষ্যতের জন্যও। ...রাজনৈতিক নেতা, সমাজ সংস্কারক প্রভৃতি জাগতিক বিষয়ে কৃতী ব্যক্তিদের মতো তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব-প্রভাব (পুরাতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) ক্রমশঃ ম্লান না হইয়া বরং উত্তরোত্তর অধিকতর প্রোজ্জ্বল হইতে থাকে।' (স্বামী আত্মানন্দ : নিবেদন, মনীষীদের দৃষ্টিতে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ)।

সর্বজনের কল্যাণ ছিল প্রণবানন্দজী মহারাজের জীবনব্রত। তাই সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন আচার্য সকলের সঙ্গে থেকেও কারও সঙ্গেই যুক্ত থাকতেন না। সে কারণেই যৌবনে বিপ্লবীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন থাকলেও নিজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হননি তাঁদের সঙ্গে। একই ভাবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়েও কোনো রাজনৈতিক দলেই যোগ দেননি তিনি। কিন্তু ত্রিশের দশক থেকে সাম্প্রদায়িকতার উগ্ররূপ এবং হিন্দুদের অসহায় অবস্থা দেখে তিনি দেশের নেতা-বুদ্ধিজীবীদের কাছে আকুল আবেদন জানান, '...আমি দেখিতে পাইতেছি বাঙ্গালি জাতি ধ্বংসোন্মুখ। এমনিই সময় আসছে সামনে, যখন বাঙ্গালি জাতি পাগলের মতো ছুটে বেড়াবে। মাথা গুঁজবার ঠাঁই পাবে না, পোকামাকড়ের মতো পথে ঘাটে মরবে। আপনারা আমার পিছনে দাঁড়ান। আমি বাঙ্গালি জাতির রক্ষার একটা চেষ্টা করে যাই।'

তখন তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। অনেকে এড়িয়ে গেছেন। কাজে নামেননি প্রায় কেউই। একমাত্র হিন্দু মহাসভা ছিল এব্যাপারে সক্রিয়। তাই প্রণবানন্দজী মহারাজও হাত মেলান তাঁদের সঙ্গে।

বস্তুত, তাৎক্ষণিক রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ভয়াবহতা ও হিন্দুর আসন্ন বিপর্যয় আচার্যকে এতই উদ্বিগ্ন করে তোলে যে ধর্মগুরু হয়েও তিনি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভার সহিত সংযোগ রক্ষা করার কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি মহাসভার রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সংগঠন আন্দোলনকে পরস্পর অনুপূরক ও পরিপূরক রূপে গ্রহণ করেন এবং বলেন, হিন্দু মহাসভা রাজনৈতিক সংগ্রাম করুক, আর আমরা করি গ্রামগুলির সংগঠন। তিনি এনসি চ্যাটার্জি, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে প্রায়শই ডেকে আনতেন নিজের কাছে, উৎসাহ দিতেন, অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতেন। ...ড. শ্যামাপ্রসাদের কণ্ঠে আপন কণ্ঠস্থিত মালা পরিয়ে দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং শক্তিসঞ্চার করেন।" (স্বামী নির্মলানন্দ : 'বঙ্গের হিন্দু ও সমাজ বিবর্তন', প্রণব, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩)।

প্রণবানন্দজী মহারাজের তৎকালীন কর্মধারা ও লক্ষ্যের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদও একাত্মতাবোধ করেন। প্রণবানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর স্মৃতিচারণে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, ''...তাঁহারই দূরদৃষ্টি বহু বর্ষ পূর্বে হিন্দু সমাজের রক্ষা ও সংগঠন কল্পে মিলন মন্দিরে ও রক্ষীদল' গঠন আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহারই শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার ফলে শক্তি সমন্বিত এই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' সম দুর্বল ও লাঞ্ছিত হিন্দুকে বিপদে উন্নতশির হইতে শিক্ষা দিতেছেন, ...সেই ভবিষ্যৎ যুগের অগ্রদূত, যে যুগে হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দুর সভ্যতা আবার শান্তিপূর্ণ অভিযানে বিশ্ববিজয় করিতে সমর্থ হইবে এবং সেই গৌরবময় যুগের চিত্র দেখিয়াছিলেন আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ— সেই দর্শনকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য দেশকে, জাতিকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া গিয়াছেন তিনিই।" (জ্যোতির্ময় ভারতের দিব্যস্রষ্টা আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। মনীষীদের দৃষ্টিতে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ)।

প্রণবানন্দজী মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর হিন্দু বাঙ্গালির জন্য নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যান ড. শ্যামাপ্রসাদ। তাঁর সেই সংগ্রাম সম্পর্কে কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করে বিতর্কের সৃষ্টি করছেন একথা সত্য। তবে শ্যামাপ্রসাদ উদ্যোগী না হলে পুরো বঙ্গপ্রদেশই যে পাকিস্তান ভুক্ত হতো একথাটা বিস্মরণ হচ্ছেন তাঁরা। অবশ্য সঙ্কটের মোকাবিলায় সক্রিয় না হয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে ঐতিহাসিক তথ্যকে বিকৃত করে যুক্তিহীন মন্তব্য করে

সংবাদ শিরোনামে আসার চেষ্টাটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। সন্দেহ নেই, এটা এক ধরনের বিকৃতকাম মানসিকতারই নগ্নরূপ। এটা জাতির দুর্ভাগ্যেরই এক কলঙ্কিত ছবি।

বর্তমানের সাগর-পুলিনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা-সমীহায় মাথা নত করতে হয় ভারত গগনের দুই জ্যোতিষ্ক স্বামী প্রণবানন্দজী এবং ড. শ্যামাপ্রসাদের সামনে। স্বীকার করতেই হয়, হিন্দু এবং সার্বিকভাবে মানব কল্যাণে এক সন্ন্যাসী ও এক সংসারীর ক্লান্তিহীন সংগ্রামে সৃষ্টি হয়েছে ভারত ইতিহাসের এক কনকদ্যুতি অধ্যায়।

তাঁদের ওই ভূমিকার অবমূল্যায়নের যে কোনো প্রয়াস জাতীয়- অকৃতজ্ঞতারই দূরপনেয় এক লজ্জা-কেতন। সেই কৃতঘ্নতা ও বিড়ম্বনার ধ্বজা ওড়ানো আমাদের কাজ নয় কোনো মতেই। ওই কলঙ্ক-সলিলে ডুবতে চাই না আমরা কেউই। তাই না! ◻

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘ

দীপক খাঁ

একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সুবিশাল কর্মযজ্ঞ ভারতের বাইরে পরিব্যাপ্ত। ধর্ম প্রচার, তীর্থ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, জনসেবা, সমাজ কল্যাণ, জাতি গঠন, সমাজ গঠন, অনুন্নত কর্মযজ্ঞের উন্নয়ন, অনগ্রসর উপজাতির কল্যাণ, সংস্কৃতির উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মযজ্ঞের সূচনা— ওই সঙ্ঘের মাধ্যমে শুরু করেছেন শিবকল্প কর্মযোগী আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ।

স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ ছিলেন আজন্ম সন্ন্যাসী। আজন্ম সাধক ও আজন্ম নেতা। তাঁর বয়স যখন মাত্র পনেরো ষোলো সেই সময় থেকেই রাতের পর রাত অতিবাহিত হয়েছে নিদ্রাহীন অবস্থায় যোগ সাধনায়। সেই সময় থেকেই অভিহিত হতে থাকেন ব্রহ্মচারী নামে। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ভুঁইয়া পরিবারে ব্রহ্মচারী বিনোদের জন্ম। পিতা বিষ্ণুচরণ ভুঁইয়া ও মাতা সারদা দেবীর তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান। পরিবারের কুলদেবতা নীলরুদ্র শিব তাঁর গর্ভে পুত্ররূপে আবির্ভূত হচ্ছেন। যথাকালে মাঘী পূর্ণিমার গোধূলি লগ্নে ভূমিষ্ঠ হন বিনোদ। সন্ন্যাস জীবনে বুধবারে জন্ম তাই ডাক নাম বুধা। অন্নপ্রাশনের সময় নতুন নামকরণ হয় বিনোদ। তিনি স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ নামেই বয়স্ককালে মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রণাম লাভ করেন। যথাসময়ে লেখাপড়া আরম্ভ হয় বাজিতপুরের প্রিন্স এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাইস্কুলে যান কিন্তু লেখাপড়ায় তেমন মন বসে না। পাঠ্যপুস্তকের পাতার বাইরে ঈশ্বরীয় বিষয়েই তাঁর আগ্রহ বেশি। প্রতি মুহূর্তে তাঁর মন তোলপাড় করে— কার সৃষ্টি এই বিশ্বসংসার, গাছপালা, জীবজন্তু, চন্দ্র, সূর্য এসব। দেব-দেবীরাই-বা কারা? দু-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে উত্তর জানতে চাইবেন। দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, সমাজের মানুষের বিপুল সমস্যা তাকে ভাবিত করে তোলে।

তিনি বইতে পড়েছেন— গৌতম বুদ্ধদেব মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা অসহায়তা দেখে রাজ্যপাট স্ত্রী-সন্তান আপনজন ছেড়ে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। দীর্ঘ সাধনার পর মানুষের মুক্তির সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। নিজের অজ্ঞাতেই দিনে দিনে বিনোদের মন সন্ন্যাস ও সাধনার দিকে ঝুঁকতে থাকে। কতই-বা বয়স তখন, বছর চৌদ্দ-পনেরো। এর মধ্যেই বিনোদের নির্জনে ধ্যানের অভ্যাস গড়ে ওঠে। বিনিদ্র রাত অতিবাহিত হতে থাকে। গভীর ভাব— তন্ময়তায়। ঘোর অমাবস্যার রাত্রে

ফঃ ৫

গ্রামের জনহীন শ্মশানে কিংবা গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী বটগাছের নীচে তিনি ধ্যানে ডুবে থাকেন। বাজিতপুর গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনদুর্গা। খালপাড়ের অরণ্যে একটি শ্যাওড়া গাছের নীচে বনদুর্গার বেদী। পালাপার্বণে বা বিশেষ মানসিক আদায়ের জন্য মাঝেমধ্যে বাজিতপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন খাল পেরিয়ে এখানে আসে বনদুর্গার পূজা দিতে। দিনেই এসে দিনেই ফিরে যায়। গোটা অঞ্চল রাতেরবেলা জেগে থাকে কিছু নিশাচর প্রাণী। ভয়ংকর এই শ্মশানভূমি দিনের বেলাতেও মানুষ সভয়ে এড়িয়ে চলে। কিশোর বিনোদ কিন্তু অকুতোভয়।

প্রথম প্রথম বাড়ির কাছেই একটা ঘরে বসতেন। সেখানেই ধ্যানের শুরু, এরপর শ্মশান আর এই অরণ্য হয়েছে তাঁর ধ্যানের আসন। নৌকার মানুষ যাতে ভয় পেয়ে কোলাহল জুড়ে না দেয়, তাঁর ধ্যানে যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেইজন্য ছোটোভাই ভোলাকে ত্রিশূল হাতে খালের পাড়ে পাহারায় নিযুক্ত রাখতেন। একথা জানতেন শুধু তাঁর প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে পূজার ছুটিতেই তিনি বিনোদ গিয়ে উপস্থিত হন উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে। শুভযোগে বিনোদ মহাযোগী গম্ভীরানাথজীর কাছে দীক্ষা লাভ করলেন। বাজিতপুরে ফিরে এসে শুরু হয় বিনোদের দুষ্কর তপস্যা। শেওড়া গাছের অরণ্যে এবং শ্মশানে যেখানে সূত্রপাত ঘটেছিল বালক বিনোদের ধ্যান-তপস্যা, গুরুর কৃপায় সেখানেই ঘটল তাঁর পরম সিদ্ধি। তন্ত্রমতে তিনি হলেন শিবত্বে অধিষ্ঠিত। সাধনায় সিদ্ধযোগী বিনোদের কণ্ঠে এবার ঘোষিত হলো মহাবাণী— এ যুগ মহাজাগরণের যুগ। এ যুগ মহামিলনের যুগ, মহা সমন্বয়ের যুগ। এ যুগ মহামুক্তির যুগ।

গৌতম বুদ্ধের আদর্শে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হিন্দুদের মহা সমন্বয়ে এক মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখতেন বিনোদ। এবার দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন করলেন তিনি। গোটা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে তখন দুর্বার স্বাধীনতা আন্দোলন। ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর বিপ্লবী কেন্দ্রের সংগঠক বিপ্লবী পূর্ণদাস বাজিতপুরে এসে যোগাযোগ করলেন স্বামী প্রণবানন্দের সঙ্গে। তারপর একে একে বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা থেকেও বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণরা আসতে থাকে।

ব্রহ্মচারী বিনোদ এই বিপ্লবীদের মধ্যে সঞ্চারিত করলেন আধ্যাত্মিকতার মহামন্ত্র। তিনি বলতেন, বিপ্লবী যুবকেরা এক একটি যেন দেবশিশু। পরবর্তীকালে দেবশিশু এই বিপ্লবীরাই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কাজে আত্মনিবেদন করেন। ব্রহ্মচারী বিনোদের কাছে বিপ্লবী-যুবকদের যাতায়াতের খবর ব্রিটিশ পুলিশের সন্দেহ উদ্রেক করল। ফলে অচিরেই ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি রূপে গ্রেপ্তার হলেন ব্রহ্মচারী বিনোদ। অবশ্য শেষ অবধি প্রমাণের অভাবে তিনি ছাড়া পেয়ে যান। তারপর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াগ কুম্ভমেলায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন গোবিন্দানন্দ গিরির কাছে। তাঁর নতুন নামকরণ হলো স্বামী প্রণবানন্দ। ওই বছরেই মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে তাঁর প্রথম সারির সাতজন শিষ্যকে নিয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন।

ভারতের তীর্থসংস্কার এবং সেই সঙ্গে তীর্থযাত্রীর নিরাপত্তা বিধানে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের রয়েছে এক ঐতিহাসিক অবদান। একবার গোরক্ষপুর যাওয়ার পথে তিনি পিতৃতীর্থ গয়ায় নেমেছিলেন স্বর্গত পিতার শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে। তীর্থপাণ্ডা ও ছড়িদাররা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুরু করল টানাহ্যাঁচড়া। এই কুৎসিত আচরণের তীব্র প্রতিবাদ না করে পারলেন না তিনি। ক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িদাররাও তার উপর ওপর চড়াও হলে রুদ্ররূপ ধারণ করলেন তিনি। তাঁর সেই রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে পিছিয়ে যায় ছড়িদাররা।

এই প্রসঙ্গে তিনি পরে বলেছেন, 'সেইদিন আমার সংকল্প জাগলো, গয়াতীর্থের সংস্কার করব।' আজ গয়াযাত্রী হিন্দুদের কাছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কেবলমাত্র গয়া নয়, একে একে সমস্ত হিন্দুতীর্থগুলিতে সংস্কারের কাজে হাত লাগালেন তিনি। দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত হলো হিন্দু মিলন মন্দির। কালক্রমে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী সঙ্ঘ সৃষ্টি করেছে সেবাব্রতের মহান ইতিহাস।

প্রতিটি হিন্দু মিলন মন্দিরে লেখা থাকে :

লক্ষ্য কি?

—মহামুক্তি, আত্মোপলব্ধি।

মহাপাপ কি?

—দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা।

ধর্ম কি?

—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য।

মহাশক্তি কি?

—ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা।

মহামৃত্যু কি?

—আত্মবিস্মৃতি।

প্রকৃত জীবন কি?

—আত্মবোধ, আত্মস্মৃতি, আত্মানুভূতি।

মহাপুণ্য কি?

—বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব।

মহাশত্রু কি?

—আলস্য, নিদ্রা, জড়তা, রিপু ও ইন্দ্রিয় সমূহ। □

আচার্য প্রণবানন্দজী

এক দূরদর্শী হিন্দু সন্ন্যাসী

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রামে ১৩০২ বঙ্গাব্দের ১৬ মাঘ (১৮৯৬ সালের ২৯ জানুয়ারি) পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বিষ্ণুচরণ দাস (ভুঁইয়া) ও মাতা সারদাদেবী। পরিবারের কুলদেবতা ছিলেন নীলরুদ্র শিব। মধ্যযুগে বঙ্গের বারো ভুঁইয়ার অন্যতম যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে এই পরিবারের আত্মীয়তা ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। সেজন্য তাঁদের পদবির সঙ্গে সম্মানসূচক 'ভুঁইয়া' যুক্ত হয়। ভুঁইয়া অর্থে ভূমধ্যকারী বা জমিদার বোঝায়। বিষ্ণুচরণ তাঁর তৃতীয় পুত্রকে আদর করে ডাকতেন জয়নাথ। বুধবার জন্ম বলে বাড়ির কেউ কেউ তাঁকে বুধো বলে ডাকত। অন্নপ্রাশনের সময় তাঁর নাম রাখা হয় বিনোদ।

শৈশবকাল থেকেই অত্যন্ত শান্ত, ধীর-স্থির ছিল বিনোদ। পড়ত বাজিতপুর স্কুলে। প্রায়শই নিজের চিন্তায় ডুবে থাকত। প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা ধ্যান করত। এইভাবে বালক বিনোদ ধীরে ধীরে ব্রহ্মচারী বিনোদে পরিণত হলো। আহারে বিশেষ রুচি ছিল না। নুন ভাত, জল ভাত, আলু সেদ্ধ ভাত, ডাল ভাত ছিল তাঁর খাদ্য। অথচ এই খেয়েই প্রত্যহ মুগুর ভাঁজতেন, অজস্র বার ডন বৈঠক দিতেন। শরীরে ছিল হস্তীর বল। ১৯১৭-এ মাঘী পূর্ণিমার দিনই বাজিতপুরে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯২৩-এ মাঘী পূর্ণিমার দিন সঙ্ঘের নামকরণ করা হয় 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'।

বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক : পূর্ববঙ্গের বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্রহ্মচারী বিনোদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিশেষত ফরিদপুর জেলার বিখ্যাত বিপ্লবী সন্তোষ দত্ত ও পূর্ণচন্দ্র দাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। নিশিকান্ত দত্ত আচার্যের ঘনিষ্ঠ সহকারী ছিলেন। তিনি লিখছেন— একদিন রাত্রি প্রায় ২টা বাজে। ধরণী গভীর সুপ্তিমগ্না, প্রকৃতি নীরব, নিথর। আশ্রমের কুটিরে আমি ও ব্রহ্মচারীজী শায়িত আছি। হঠাৎ কে যেন দরজায় মৃদু করাঘাত করে অনুচ্চ স্বরে ডাকল— 'বিনোদদা আছেন নাকি?' এত গভীর রাতে সেই ডাক শুনে ব্রহ্মচারীজী উঠে বসে বললেন— 'দরজা খুলুন।' আমি দরজা খুলে দেখি ৩-৪ জন যুবক সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। আলো জ্বালতে গেলে তিনি নিষেধ করলেন। আগন্তুক যুবকদের তিনি ভিতরে ডাকলেন। তারা একজন তাঁর কানে কানে কী বলল এবং তারপর বাইরে জঙ্গলের ভিতরে চলে গেল। তিনি আমাকে বললেন— 'শীঘ্র সাত জনের মতো ভাত-ডাল রান্না করতে হবে। এরা আজ সারাদিন কিছু খায়নি।' আসলে ব্রিটিশ পুলিশের তাড়া খেয়ে এই যুবক দল সারাদিন ধরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। ফলে সারাদিন কিছু খেতেও পারেনি। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এই বিপ্লবী দলকে তিনি খাওয়ালেন। তারপর তাঁরা বিদায় নেয়। এরকম ঘটনা আরও দু-তিন বার ঘটেছিল।

জনসেবায় হাতেখড়ি : ১৯২১-এ খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সংবাদ পেয়েই স্বামী প্রণবানন্দ তাঁর অনুগত ছাত্র

ও তরুণদের নিয়ে সেই অঞ্চলে ছুটে গিয়ে সেবাকার্য আরম্ভ করেন। কিন্তু এই বিরাট সেবাকার্যে বহু লোক ও বহু অর্থের প্রয়োজন। খুলনা জেলার অন্যতম সুসন্তান ভারতবিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আচার্যদেবের পিছনে দাঁড়ালেন। স্বামী প্রণবানন্দও বিভিন্ন স্কুলে-কলেজে ঘুরে ঘুরে প্রায় ৫০০ জন তরুণ কর্মী সংগ্রহ করলেন। তাদেরকে দিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রায় আট মাস যাবৎ অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সেবাকার্য পরিচালনা করলেন। এই ঘটনার পর স্বামী প্রণবানন্দজীর সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

শক্তি সাধনার প্রবর্তন : আচার্যদেবের ইচ্ছা ছিল যে তিনি জাতীয় জীবনে শক্তি সাধনার প্রবর্তন করবেন। ১৯২৮ সালে তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীধামে তিনি দুর্গাপূজা শুরু করেন। শক্তিপূজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'হিন্দু তুমি কি জানো না যে তুমি শক্তির পূজক, মহাশক্তির উপাসক? তোমার সেই শক্তির সাধনা কোথায়? একবার ধীর, স্থির হয়ে চিন্তা কর— তোমার উপাস্য দেব-দেবীর সেই মহাবীরত্ব-ব্যঞ্জক লীলাভিনয়। শিবের হাতে ত্রিশূল, তাহা দেখে তুমি কী চিন্তা করবে? শ্রীকৃষ্ণের হাতে সুদর্শন, শ্রীরামচন্দ্রের হাতে ধনুর্বাণ, মা কালীর হাতে রক্তাক্ত খড়্গ— তাহা দেখে তুমি কী ভাবনা ভাববে? দশ হস্তে দশ প্রহরণধারিণী মা দুর্গার দিকে তাকিয়ে তোমার ভিতরে কী চিন্তা আসবে? এই মহাশক্তির সাধনা করে কী মানুষ দুর্বল হয়, না সবল হয়? সাধক! একবার বিশেষভাবে এই সমস্ত কথা চিন্তা কর। তারপর তুমি ভেবে ও বুঝে দেখ যে, তোমার শক্তির পূজা ও সাধনা ঠিক ঠিক হচ্ছে কিনা। যদি না হয়ে থাকে, তবে ঠিক কর যে— এখন থেকে কীভাবে তোমার আরাধ্য দেবতার পূজা উপাসনা করবে?'

হিন্দু মিলন মন্দির ও হিন্দু রক্ষী দল গঠন : হিন্দু সমাজ সমন্বয় আন্দোলন তথা হিন্দু মিলন মন্দির ও রক্ষীদল গঠন আন্দোলন প্রবর্তন প্রণবানন্দজী মহারাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। ১৯৩৪ সালের শেষ থেকে তিনি এই আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং তখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি নিজেই বলেছিলেন— 'সর্বশেষে সর্বনিয়ন্তার বিশেষ ইচ্ছায় হিন্দু সংগঠন ও হিন্দু মিলন মন্দির আন্দোলনের আরম্ভ— অধ্যাত্ম সাধনার মহাব্রত। ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল ইহাতেই নিহিত রয়েছে।' তিনি আরও বলেন— 'হিন্দুতে হিন্দুতে মিলন যত শীঘ্র গড়ে উঠবে, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানে মিলন তত শীঘ্র সম্ভব নয়। কারণ মিলন হয়— সমানে-সমানে, সবলে-সবলে; সবলে ও দুর্বলে কখনো মিলন হয় না। সুতরাং বিশাল হিন্দু জনগণ যখন সমস্ত ভেদ-বিবাদ-বিরোধ ও অস্পৃশ্যতা ভুলে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হবে, তখনই অন্যান্য জাতির সঙ্গে তার মিলন সহজ ও সম্ভব হবে।' হিন্দুদের গলদ সম্পর্কে তিনি বলছেন— 'হিন্দুর বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অর্থ আছে, ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্যও যথেষ্ট আছে। কিন্তু নাই কেবল তাদের মধ্যে একতা, সঙ্ঘবদ্ধতা বা সংহতি শক্তি। তাদের মধ্যে এই সঙ্ঘশক্তি জাগিয়ে দিতে পারলেই হিন্দুজাতি জগতে অজেয় হয়ে দাঁড়াবে।' এই দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতা দূর করার জন্যই তিনি 'হিন্দু মিলন মন্দির' আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাছাড়া গ্রামের যুবকদের নিয়ে প্রত্যেক মিলন মন্দিরে একটি করে 'হিন্দু রক্ষীদল' গঠন করেন। এই রক্ষীদল সম্পর্কে যুগাচার্য বলেন— 'সমগ্র হিন্দু-সমাজকে ধর্ম-মান-ইজ্জত, স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার্থে সজাগ ও সতর্ক করে তুলবার জন্যই আমার এই রক্ষীদল গঠন আন্দোলন। অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের জন্য স্থিরসঙ্কল্প যে, দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতেও হিন্দুর ধর্ম, মান, ইজ্জত, স্বার্থ ও অধিকারে কাকেও হস্তক্ষেপ করতে দিব না— এরূপ সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার সেই হবে প্রকৃত রক্ষী।'

শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ : ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রণবানন্দজী মহারাজের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে ভারত সেবাশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী অরুণানন্দ তাঁর 'শ্রী শ্রী প্রণবানন্দ চরিতামৃত' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১০০) লিখেছেন, ''১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে জন্মাষ্টমীর শুভ তিথিতে কলকাতার বালিগঞ্জে এক বিরাট হিন্দুধর্ম সম্মেলনে প্রখ্যাত দেশনেতা বাঙ্গালির গৌরব ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। সম্মেলনের পূর্বে ভগবান আচার্যদেব পর পর পাঁচদিন ড. শ্যামাপ্রসাদকে তাঁহার নিকটে আনবার জন্য সন্ন্যাসীদের প্রেরণ করেন। কিন্তু অত্যধিক কাজের চাপে তিনি তখন আসতে পারেন নাই। শেষে জন্মাষ্টমীর সম্মেলনের দিন বৈকাল ৫ টায় শ্রীমৎ আচার্যদেব মণ্ডপের সামনে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ড. শ্যামাপ্রসাদ আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীমৎ আচার্যদেব তাঁহাকে লইয়া সভামণ্ডপে উঠিলেন। মঞ্চের উপর উঠিয়া শ্রীশ্রী আচার্যদেব সহস্র উৎসুক দর্শকের সামনে স্বীয় কণ্ঠের আশীর্বাদী ফুল মালা স্বহস্তে ড. শ্যামাপ্রসাদের গলায় পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ দান ও শক্তি সঞ্চার পূর্বক স্বীয় আসন গ্রহণ করেন। এতে প্রবীণ সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীরা এবং দর্শক জনসাধারণ বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে যান। কারণ ইতিপূর্বে শ্রীশ্রী আচার্যদেব কখনো কারও গলায় স্বহস্তে মালা পরাইয়া দেন নাই।'' সম্মেলনের শেষে বিশ্রাম মন্দিরের কক্ষে প্রবেশ করে তিনি পূজ্য শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দজীকে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— 'আজ বাঙ্গালি হিন্দুর স্বপক্ষে দাঁড়াইবার লোক ঠিক করিয়া দিয়ে এলাম।'

১৯৪১ সালের ৮ জানুয়ারি আচার্য প্রণবানন্দজী মহারাজ কলকাতার বালিগঞ্জ আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। □

মাঘী পূর্ণিমার তাৎপর্য

সূর্যশেখর হালদার

ভারতীয় ক্যালেন্ডারের প্রত্যেক মাসেই অন্তত একটি করে পূর্ণিমা আসে। পূর্ণিমার দিনটি সনাতন সংস্কৃতিতে পবিত্র বলে মানা হয়। পূর্ণিমাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা গুরুপূর্ণিমা, শ্রাবণ পূর্ণিমা বা রাখীপূর্ণিমা, কার্তিক পূর্ণিমা বা শরৎ পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোলপূর্ণিমা। মাঘী পূর্ণিমা বা মাঘ পূর্ণিমা হলো মঘানক্ষত্রযুক্ত মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথি। এই দিনে চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শনি তিনটি গ্রহই অশ্লেষা নক্ষত্রে তাদের নিজস্ব রাশিতে উপস্থিত থাকে। এই দিনটি সনাতন হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসবের দিন। সনাতন ধর্ম অনুযায়ী এই তিথিতে দেবতারা মর্ত্যলোকে ভ্রমণ করতে আসেন। এই তিথিতে কোনো তীর্থ বা গঙ্গা স্নান ও দান করলে ভগবান প্রসন্ন হন। তাই এই তিথিতে মন্দির দর্শন ও গঙ্গা স্নান করার রীতি আছে। ভারতের চারটি নগরে (হরিদ্বার, প্রয়াগরাজ, নাসিক ও উজ্জয়িনী) পূর্ণ কুম্ভ আয়োজিত হয়। পূর্ণ কুম্ভমেলা প্রতি বারো বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় এবং মাঘী পূর্ণিমার সময় মাঘ মেলাটি বার্ষিক ভিত্তিতে তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলে বা ত্রিবেণী সঙ্গমের চারপাশে প্রয়াগরাজের মতো নগরে অনুষ্ঠিত হয়।

গৌতম বুদ্ধের জীবনেও এই তিথির বিশেষ গুরুত্ব আছে। তিনি এই তিথিতে তাঁর মহাপরিনির্বাণের কথা ঘোষণা করেন। কথিত যে পঁয়তাল্লিশ বর্ষাবাস অর্থাৎ অন্তিম বর্ষায় তিনি রাজগৃহের বেণুবনে অধিষ্ঠান করেন। সে সময় তিনি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হন। পরে প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর ধ্যানবলে রোগমুক্ত হন। বর্ষাব্রত শেষ করে দেশ পরিভ্রমণের ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি ক্রমে বৈশালীর চাপালচৈত্যে উপস্থিত হন। তখন তার বয়স পূর্ণ হয় আশি বছরে। এ সময় তিনি চাপালচৈত্যে ধ্যানস্থ হয়ে ভাবলেন তাঁর মহাপরিনির্বাণের সময় সন্নিকটে। এই পবিত্র মাঘী পূর্ণিমার দিনে তিনি আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে আনন্দ, অচিরেই তথাগত পরিনির্বাণ পাপ্ত হবেন। এখন থেকে তিন মাস পর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই আমি পরিনির্বাপিত হব।' বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ঘোষণা শুনে তার শিষ্য-প্রশিষ্যরা সবাই ব্যথিত হন, কান্না করেন। তখন বুদ্ধ তাঁদের উদ্দেশে বলেন, 'অনিচ্ছা বত সঙখরা, উপ্পাদা বয় ধম্মিনো, উপ্পাজিত্বা-নিরুজ্জন্তি ততো উপ সম সুখো।' অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিলয় জগতের নিয়ম। উৎপত্তি হয়ে নিরুদ্ধ হওয়া জাগতিক ধর্ম। এই মহাসত্যটি জীবন ও জগতের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মাঘী পূর্ণিমা হলো বুদ্ধের পরিনির্বাণ ঘোষণার তিথি।

মাঘী পূর্ণিমা বিষয়ে আরেকটি কিংবদন্তী আছে। কথিত, পুরাকালে কান্তিকা নগরীতে ধনেশ্বর নামে একজন গরিব ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ব্রাহ্মণের কোনও সন্তান ছিল না। ব্রাহ্মণের দিন কাটছিল খুবই দুঃখে। ভিক্ষা করে কোনো রকমে দিন চলছিল। এমনই একদিন ভিক্ষায় বের হলেন ব্রাহ্মণ। সেসময় নগরীর বাইরে জনৈক ধনীর বাড়িতে তিনি এলেন ভিক্ষা করতে। কিন্তু সেখান থেকে ব্রাহ্মণকে খালি হাতেই ফিরতে হলো, কারণ নিঃসন্তান ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিতে চাননি বাড়ির মালিক। ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরে কাঁদতে লাগল আর তার স্ত্রীকে সবটা খুলে বলল। সব শুনে স্ত্রী রূপবতী উপায় খুঁজতে লাগল। তখনই একজন এসে বলল তোমরা মা কালীর পূজা কর এবং চন্দ্রিকা দেবীর আরাধনা কর, এতে তোমরা সন্তান লাভ করতে পারবে। তাই শুনে তারা মাঘী পূর্ণিমার এই পূজা করে এবং তাদের সন্তান লাভ হয়। এই তিথির আরেকটি বিশেষত্ব হলো এটি সন্ত রবিদাসের আবির্ভাব তিথি। তিনি ছিলেন একজন কবি ও সাধক এবং বৈষ্ণবীয় পরম্পরার ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরুষ। ১৪৫০ সালে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর কাছে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫২০ সালে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন। তাঁর বহু শ্লোক শিখ ধর্মগ্রন্থ আদি গ্রন্থ সাহেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই শিখপন্থীরাও এই বৈষ্ণবীয় সাধককে স্মরণ করেন। শিখ পন্থা যে হিন্দু সংস্কৃতির থেকে পৃথক নয় এই ঘটনা তার একটি প্রমাণ। বঙ্গজীবনে মাঘী পূর্ণিমার উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এই দিনে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ আবির্ভাব তিথি। আর উল্লেখযোগ্য হলো, এই তিথিতেই তিনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

সব দিক বিবেচনা করে দেখা যায় মাঘী পূর্ণিমা ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক পবিত্র দিন। তাই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে এই আধুনিককালেও এই দেশে মাঘী পূর্ণিমা পালিত হয়। □

ওড়িয়া বাজারের বাঙ্গালি যুবক

তাঁর জন্ম ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি। তাঁদের পরিবার ছিল বিরাট, সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত। বাবা জানকীনাথ বসু ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী। মা প্রভাবতী দেবী ধর্মপ্রাণা মহিলা। তাঁরা অনেক ভাই-বোন। তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ। তাই মায়ের তিনি ছিলেন বড়ো আদরের। ছোট্টো বন্ধুরা, তিনি সুভাষচন্দ্র বসু। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ায় তাঁকে বিশ্ববাসী **নেতাজী** নামে জানে। তাঁদের নিবাস ছিল কটকের ওড়িয়া বাজারে। এখন তাঁদের বাড়িটি **নেতাজী জন্মস্থান সংগ্রহালয়**।

সুভাষ বাল্যকালে কটকের প্রোটেস্টান্ট ইউরোপিয় স্কুলে ভর্তি হন। ষষ্ঠশ্রেণী পর্যন্ত তিনি এখানে পড়েছিলেন। এখানকার বিদেশি আদবকায়দা তাঁর ভালো লাগেনি। পদে পদে ভারতীয়দের অসম্মান করা হতো। বাল্যকালেই তাঁর মন তীব্র দেশপ্রেমে ভরপুর থাকার জন্য তিনি এসব সহ্য করতে পারতেন না। পরে তিনি রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। এখানে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ও সংস্কৃত শেখানো হতো। বেদ, উপনিষদও পড়ানো হতো। স্কুলে তিনি ভারতীয় পোশাক পরে যেতেন।

রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে সব ছাত্র তাঁর বন্ধু হয়ে যায়। তাঁর কথাবার্তায় বন্ধুরা তাঁর দেশপ্রেমের পরিচয় পায়। দেশে তখন স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক কাজ চলছিল। তখন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বেণীমাধব দাস। তিনি সুভাষের মনে দেশপ্রেমের পরিচয় পেয়ে তাকে আরও উৎসাহিত করেন। সুভাষ তখন হোস্টেলে থাকতেন। হোস্টেলে সহপাঠীদের সংগঠিত করে তিনি ক্ষুদিরাম বসুর বলিদান দিবস পালন করেন। তাও আবার অভুক্ত থেকে। এই ঘটনা যখন তাঁর বাবা জানতে পারেন তখন তিনি সুভাষকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। কিন্তু সুভাষ তাতে দমেননি। তিনি তাঁর ঘরে বিপ্লবীদের ছবির সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি রাখতেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি নিজের গুরু হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। স্বামীজীর বাণী ও রচনা তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়তেন।

সুভাষের মনে ধর্মভাব প্রবল ছিল। কটকের পুরীঘাট নামক স্থানে এক বৈষ্ণব সাধু থাকতেন। সুভাষচন্দ্র প্রায়ই তাঁর কাছে গিয়ে ধর্মকথা শুনতেন। আধ্যাত্মিকতার টানেই তিনি একসময় তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে সাধু হয়ে তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

আদর্শের প্রতি সুভাষচন্দ্রে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আদর্শবান শিক্ষক বেণীমাধব দাসকে তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু মনে করতেন। সুভাষের জীবন গঠনে এনার বিশাল। বেণীমাধববাবু রাভেনশো কলেজিয়েক স্কুল থেকে বদল হয়ে যায়, তখন নারায়ণপ্রসাদ মহান্তি নামে ইংরেজির শিক্ষক প্রধান শিক্ষক হিসেবে আসেন। তাঁর সঙ্গেও সুভাষের প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিক্ষকদের তিনি কারকম শ্রদ্ধা করতেন তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সুভাষচন্দ্র তখন রাজনীতিতে। কটকে একটি জনসভায় ভাষণ দেবার পর সবাইকে অবাক করে দূরে একটি গাছের আড়ালে থাকা একজনের কাছে গিয়ে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। সমস্ত মানুষ অবাক। আসলে ওই ব্যক্তি ছিলেন র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলের তাঁর সংস্কৃতের শিক্ষক বিশ্বনাথ কবিরাজ। স্কুল থেকে তিনি ছুটি নিয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্রকে একবার দেখবার জন্য। সরকারি স্কুলের শিক্ষক হবার জন্য দূরে অঅড়ালে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ লোচনে প্রিয় ছাত্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শত শত লোকের ভিড়েও প্রিয় ছাত্রের নজর পড়ে যায় তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের উপর।

সেদিনের কটকের ওড়িয়া বাজারের সেই বাঙ্গালি-যুবক ওড়িয়া যুবকদের নেতা হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই পরবর্তীকালে ভারতবাসীর নেতা তথা নেতাজী হয়ে যান।

পীযূষ খুঁটিয়া
স্নাতক, দ্বিতীয় বর্ষ, রাভেনশ ইউনিভার্সিটি
কটক।

জাতীয় উদ্যান

নকরেক

নকরেক ন্যাশনাল পার্ক মেঘালয় রাজ্যের পশ্চিম গারো পাহাড় জেলায় অবস্থিত। গারো পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো নকরেক। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪১২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এই উদ্যান বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল। লাল পাণ্ডা এখানকার উল্লেখযোগ্য আকর্ষণের প্রাণী। এশিয়ান হাতি এবং বিভিন্ন ধরনের বনবেড়াল দেখতে পাওয়া যায়। ছোটো মার্বেল বেড়াল থেকে শুরু করে রাজকীয় বাঘ ও মেঘবর্ণ চিতাবাঘ রয়েছে। মেঘবর্ণ চিতাবাঘ মেঘালয় রাজ্যের জাতীয় পশু হিসেবে গণ্য করা হয়। বিভিন্ন রকমের পাখির জন্যও এটি আদর্শ উদ্যান। পার্বত্য বাঁশের সবুজ জঙ্গল পর্যটকদের সারা বছরই আকর্ষণ করে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৫৪

ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গে

এষা - এতা: (এ– এরা)

এষা কা? (এ কে?)। **এতা: কা:?** (এরা কারা?)

এষা ভগিনী। এতা: ভগিন্য:। (এ বোন– এরা বোন)

অভ্যাস কুর্ম:--

এষা দেবী- এতা: দেব্য:।

এষা জননী - এতা: জনন্য:।

এষা নর্তকী- এতা: নর্তক্য:।

এষা পুত্রী- এতা: পুত্র্য:।

এষা সখী- এতা: সখ্য:।

প্রয়োগ কুর্ম:

(রাক্ষসী, সুন্দরী, মমতাময়ী, বান্ধবী, অর্ধাঙ্গিণী, রমণী, নারী) (বেল্লনী, কর্তরী, চালনী, অঙ্কনী, সমদর্বী, মার্জনী)

ভালো কথা

দেওয়ার আনন্দ

কদিন আগে খুব শীত পড়েছিল। এক গরিব মা একটি বাচ্চার হাত ধরে আমাদের বাড়িতে এসে ঠাকুমার কাছে পুরনো কাপড় চাইছিল। ঠাকুমা একটা শাড়ি আর একটা গায়ে দেবার চাদর দিল। আনন্দে ওই মা-টি ঠাকুমাকে প্রণাম করেছিল। আমি তখন দৌড়ে ঘরে গিয়ে মাকে বলে আমার ছোটো হয়ে যাওয়া একটা সোয়েটার,একটা প্যান্ট এনে ছেলেটির হাতে দিলাম। আনন্দে ছেলেটির চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঠাকুমা আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলল, তুই খুব ভালো দাদুভাই। তখন আনন্দে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

শঙ্কর চক্রবর্তী, বৈষ্ণবনগর, ষষ্ঠ শ্রেণী, মালদা

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) সূ ধু ন দ

(২) র অ ত্রা ক্ষ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) য়া ক্ষ তী তৃ য় অ

(২) র কূ পা ল থা অ

২০ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) শব্দদূষণ (২) বর্ষবরণ

২০ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) হিসাবরক্ষক (২) হোমরাচোমরা

উত্তরদাতার নাম

(১) বর্ণিনী সরকার, বি এস রোড, মালদা। (২) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল-৪৮।
(৩) যাজ্ঞশ্রী রায়, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (৪) শিবম রায়, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®

EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

এক দুশ্চরিত্র লম্পট নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা

ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়

আমরা জন্মসূত্রে বাঙ্গালি। মাতৃভাষা আমাদের বাংলা। আমরা বাঙ্গালি কিংবা বঙ্গের অধিবাসী বলে গর্ব অনুভব করে থাকি। আমাদের পূর্বসুরী স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, প্রীতিলতা, নেতাজী, স্বামীজী, স্বামী প্রণবানন্দ, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ ছাড়াও অনেকের নামের তালিকা রয়েছে যাদের আমরা প্রাতঃস্মরণীয় বাঙ্গালি বলে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরি। অবাক লাগে এমন মহাপুরুষদের জন্মভূমি বঙ্গের অতীত এক শাসকের কথা মনে পড়তেই আমাদের কাপুরুষ ও যবনদের পদলেহী বলে মনে হয়।

আমার ছোটোবেলায় পূজা-পার্বণে, যাত্রা-থিয়েটারে জলদ গম্ভীর কণ্ঠে রেকর্ড শুনতাম— 'বাংলা-বিহার-ওড়িশার মহান অধিপতি তুমি'...। তারপর এক নারীকণ্ঠে সুললিত ঝংকার শুনে শুনে যৌবন প্রাপ্ত হয়েছি। সেই অধিপতি বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা হলেন সিরাজ-উদ্- দৌলা। জানিনা, সুজলা সুফলা শষ্য-শ্যামলা এই মাছে ভাতে বাঙ্গালির সঠিক ইতিহাস কেউ লিখেছেন কিনা। আর যদি ছিন্ন-ভিন্ন নকশি কাঁথার মতো কেউ কেউ লিখে থাকলেও তাতে দেখি পরাজিত কাপুরুষ হিন্দু হিসেবে লেখা। এই বঙ্গে বহিরাগত দস্যু তস্কর লুণ্ঠনকারী, নারী ধর্ষণকারী এবং হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী রূপে বিধর্মীরা দিল্লি দখল করে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছে। তবে এরই মাঝে পর্তুগিজ, ফরাসি, তুর্কি ছাড়াও আরব দস্যুরা তো ছিলই। আবার তাদের পরে ইংরেজ বেনিয়ার দল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছে।

ভারতবর্ষের কথা ছেড়েই দিলাম। এই বঙ্গে নাকি মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বঙ্গের সিংহাসন দখল করেছে এক বিধর্মী সেনাপতি। জানি না এটা কেমন করে সম্ভব হয়েছে! সত্য মিথ্যা ইতিহাসবেত্তারা প্রমাণ করবেন। দিল্লির শাসনকর্তরা তাদের প্রেরিত পোষক সেনাপতি নির্বাচিত করে এই বঙ্গে পাঠিয়েছে। সঙ্গে সেনাবাহিনী ছাড়াও ছিল পির, দরবেশ ও মুর্সেদ তল্পিবাহকের দল। আর সেই শাসকেরা নবাব রূপে অত্যাচার-কুশাসন-শোষণ আর হিন্দু নিধন করে সোনার বঙ্গকে করেছে শ্মশান। ধর্মান্তরিত করেছে হিন্দুদের। এমনকী ৫-৬টি করে হিন্দু রমণী জোর করে নিকা করেছে। আর লুটপাট করে নৃশংস অত্যাচারে হিন্দুদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছে। এমনই একজন নবাব ছিলেন সিরাজ-উদ্-দৌলা। সে কিন্তু বাঙ্গালি ছিল না।

অথচ বাঙ্গালিরা তাকে বাঙ্গালি বলে থাকে। ইতিহাসকারদের এ এক ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারিতা। সে ছিল একজন বহিরাগত মুসলমানের বংশধর। প্রথমেই তার বংশ পরিক্রমায় দেখি, এক অশালীন অধর্মাচারিত ও কদাচার যবনদের সম্পর্ক বিশেষ। যেমন দেখি দিল্লির বর্বর মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেব তাঁর প্রধান মন্ত্রী মুরশিদ কুলি খাঁ ছিল একজন ক্রীতদাস। তার এক মেয়েকে দিয়েছিল তদানীন্তন ওড়িশার নবাব সুজা খাঁকে (সুজাউদ্দিন), যে ছিল খোরাশান দেশের অফশার বংশীয় মুসলমান। পরবর্তী সময়ে সুজা খাঁয়ের এক কুটুম্ব মিরজা মোহাম্মদ আত্মীয়তা সূত্রে উৎকলের নবাবের আশ্রয় লাভ করে। এই মিরজা মোহাম্মদের দুই পুত্র হাজি আহম্মদ ও আলিবর্দি খাঁ নবাবের দরবারে সর্বেসর্বা হয়ে উঠে। আলি খাঁয়ের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তার তিন কন্যাকে তারই ভাই হাজি আহম্মদের তিন পুত্র যথাক্রমে নোয়াজেস, মো: সাইয়েদ আহম্মদ ও জয়েনউদ্দিনের সঙ্গে বিয়ে দেয়। তারা যথাক্রমে পাটনা, পূর্ণিয়া ও ঢাকার শাসক ছিলেন। জয়েনউদ্দিন ও আমেনার সন্তান সিরাজ-উদ্-দৌলাকে আলীবর্দি খাঁ পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সেই সূত্রে হাজি আহম্মদের জামাতা আতাউল্লা এবং ভগ্নীপতি মীরজাফর আলি খাঁ আলিবর্দির সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, তাই তিনি দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে অবসর নেন। কিন্তু আলিবর্দি খাঁ কুটকৌশলে সুজা খাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেকে পাটনার নবাবের আসনে বসার সুযোগ করে নেন। কিন্তু গিরিয়ার প্রান্তরে যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ নিহত হলে আলিবর্দি খাঁ সুজা খাঁর শূন্য সিংহাসনে বসেন।

এই হলো মুসলমানদের জাতিগত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে স্বজন প্রীতি ও মজহবানুরাগীদের এক অভিনব দৃষ্টান্ত। কে বাবা, কে মা, কে ভাই, কে বোন, কেউ-বা নতি-নাতনি তার ঠিকঠিকানা নেই। তাদের মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে একজন আরেকজনকে হত্যা করে কিংবা ছলে-বলে-কৌশলে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করে। শুধু সিংহাসন বলে কথা নয়, সংসার কিংবা পরিবার, সম্পদ কেড়ে নিতেও তাই তারা করে থাকে। এভাবেই এক সময় নবাব আলিবর্দি খাঁর প্রিয় পোষ্যপুত্র সিরাজ-উদ্-দৌলা বঙ্গ-বিহার-ওড়িশার নবাব রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এই দেশে তো মুসলমানের নামগন্ধও ছিল না। হিন্দুস্থান ছিল কেবল হিন্দুদের আবাস ভূমি। বহিরাগত

ফঃ ৬

মুসলমানরা তরবারি ও কোরান ধারণ করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেছে। ভীতু ও স্বার্থান্বেষী কিছু হিন্দু তাদের তাঁবেদার হয়ে নিজেদের সত্তা বিসর্জন দিয়ে মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে জীবনযাপন করছিল।

যেমন রাজা মান সিংহ নিজের বোনকে বাদশা আকবরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার অধীনে সেনাপতির চাকরি নিয়েছিলেন। এই আকবরের হারেমে ছিল শত শত হিন্দু রমণী । এই মান সিংহ আকবরের হয়ে বহু হিন্দু রাজা মহারাজাকে নিধন করে তাদের রাজ্য দখল করে আকবরের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। আবার অসমের রাজা জয়ধ্বজ নিজ রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে ঔরঙ্গজেবকে পশ্চিম অসম দিয়েছিলেন। তারপরেও ঔরঙ্গজেব রাজার মেয়েকে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করে হারেমে স্থান দিয়েছিল। শুধু নবাব বাদশারাই নয়, পিরেরাও কম যায় না। যেমন দিল্লির মহারাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের অনুমতি ক্রমে আফগানিস্তানের খোরাসান নগরের অধিবাসী খাজা মঈনুদ্দিন চিস্তি মক্কা থেকে এসে আজমের শরিফে আস্তানা গেড়ে গরিব হিন্দু ও উপজাতিদের ধর্মান্তরিত করতে থাকলে পৃথ্বীরাজের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে গজনির সুলতান মাহমুদ শাহাবুদ্দিন ঘোরিকে দিল্লি দখল করার আমন্ত্রণ জানায়। ঘোরি দু'বার পরাজিত হয়েও ১১৯৩ সালে কনৌজের রাজা শ্বশুর জয়চাঁদের ষড়যন্ত্রে পৃথ্বীরাজ তৃতীয়বারে পরাজিত ও নিহত হন। তার ফলে দিল্লি ঘোরির হস্তগত হয়।

তারপর ঘোরি জয়চাঁদকে হত্যা করে নিষ্কন্টক হয়। সেই সময়ে পাটলি দুর্গের অধিপতি ছিল মালিক খাত্তাব। সে দিল্লির পাটলি দুর্গের আশেপাশের হিন্দু সামন্ত রাজাদের অনৈক্য ও দুর্বলতার সুযোগে আক্রমণ করে রাজ্যচ্যুত ও বন্দি করে হত্যা করে। আর তাদের সুন্দরী মেয়ে-বউদের গনিমতের মাল হিসেবে তার হারেমে নিয়ে যায় এবং এক সামন্ত রাজার পরমা সুন্দরী মেয়েকে তার আরাধ্য দরবেশ চিস্তিকে দাসী রূপে উপঢৌকন দেন। খাজা চিস্তি সেই দাসী রাজকন্যাকে নিকা করে। অবশ্য পরে আজমীরের শাসক সৈয়দ আজিমুদ্দিনের কন্যা বিবি ইসমতকেও শাদি করেন। আবার প্রেমের নিদর্শন তাজমহল (চন্দ্রমৌলীশ্বর মন্দির)-এর ভুয়ো নির্মাতা সম্রাট শাহজাহান তার হারেমে হাজার নারী থাকা সত্ত্বেও নিজের কন্যাকে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে ব্যবহার করেছে। এমনি তরো বহু ঘটনা রয়েছে ভারতের ইতিহাসে। এই তো হলো মুসলমান বাদশা ও পির, দরবেশদের লজ্জাকর ঘটনা। এই বঙ্গ তথা ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয়ের খতিয়ানে এমন ঘটনা বহু রয়েছে।

এছাড়াও হিন্দু রাজা ও জমিদারদের কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে সপরিবারে স্বধর্মে ত্যাগ করেছে। অপরদিকে বহিরাগত বর্বর মুসলমান শাসকেরা তাদেব অন্তরঙ্গ দেশোয়ালি ভাইবেরাদরদের সেনাদলে ফৌজদারি ও দেওয়ানিতে নানান পদে কিংবা নবাব রূপে বসিয়ে দুর্বল হিন্দুদের উপর কোরান ও সুন্নাহ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গের সিংহাসনে অধিপতি হয়ে বসে সিরাজ-উদ-দৌলা। এই অধিপতি হলো আলিবর্দি খাঁর নয়নমণি পোষ্যপুত্র সিরাজ। যার বাল্যকাল ও কৈশর ছিল অনেক কুশিক্ষা ও কুক্রিয়াসক্ত বদনেশায় আক্রান্ত জীবন। সিরাজের বুদ্ধিহীন পশু সুলভ মনিসিকতার জন্য বঙ্গের মানুষদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে ছিল তা ছিল আতঙ্কে শিহরিত হওয়ার বিষয়। শুধু তাই নয়, তার যৌবনকালের ইয়ারদের নিয়ে বাইজি নিয়ে বিলাসতরঙ্গে মদমত্ত হওয়ার লক্ষ্যে রাজধানীর কাছেই ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে কারুকার্য খচিত বহু মূল্যবান পাথর দিয়ে 'হীরাঝিল' নামে প্রমোদ ভবন নির্মাণ করে। তার ক্রূর চরিত্রের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বিলাসতরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু নবাব প্রদত্ত নির্দিষ্ট মাসিক বৃত্তিতে তার ইচ্ছানুযায়ী পাপকর্ম চরিতার্থ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই এক নতুন ফন্দি এঁটে মাতামহ আলিবর্দি খাঁকে হীরাঝিলের নতুন প্রাসাদে আমন্ত্রণ করে। আলিবর্দি খাঁও আনন্দে আত্মহারা হয়ে মহাসমারোহে একদিন হীরাঝিলে আগমন করেন। আর নবাবকে একাকী প্রাসাদ পরিদর্শনরত অবস্থায় কৌশলে একটি কক্ষে বন্দি করে ফেলে। নবাব এই বন্দি অবস্থাকে দৌহিত্রের কৌতুক বলে মনে করে শত অনুরোধেও যখন মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না তখন সিরাজের কথা মতো পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করে মুক্তি পান। সিরাজ দুষ্টবুদ্ধি চরিতার্থ করে প্রচুর অর্থ পেয়ে উৎসবে, নাচে-গানে-সুরাপানে এবং নর্তকী সমাহারে গা ভাসিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, অনুচরের মাধ্যমে বহু সুন্দরী গৃহস্থ বধূ ও কন্যাকে ধরে এনে লালসা পূরণে মনোযোগী হয়। যতদিন গত হয় সিরাজের বিলাসিতা ও নারীলোলুপতা বাড়তে থাকে। এমনই সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বঙ্গের জনতা সিরাজের নাম শুনলেই। কিন্তু তাদের হাত-পা বাঁধা ছিল। শিউড়ে উঠতে সেই সময়ে সিরাজ প্রমোদ নিদ্রায় সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল।

চতুর আলিবর্দি খাঁ মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতকে অর্থের প্রলোভনে ফাঁদে ফেলে হত্যা করে। মারাঠা সেনারা ভয়ে বঙ্গ ছেড়ে পালিয়ে যায়। সিরাজের সেক্ষেত্রে নবাব হিসেবে কোনো মাথাব্যাথা ছিল না। তবে হীরাঝিলে প্রমোদ ভবনের স্থানেই নিজের নামে 'মন্সুরগঞ্জ' নামে একটি গঞ্জ স্থাপন করে। ইতিমধ্যেই আলির্দির স্নেহ পুত্তলিকা সাজের বিকৃত মানসিকতার ভাব বেড়ে গেল। যেমন গর্ভস্থ সন্তান কেমন করে উদরে থাকে তা দেখার জন্য গর্ভিনীর উদর বিদীর্ণ করে দেখত। রাজপ্রসাদে বসে মুমূর্ষুর অঙ্গ বিক্ষোভ দেখতে নৌকায় নরনারী আবদ্ধ করে ডুবিয়ে দিয়ে হাসি তামাশায় মশগুল হতো। উপপত্নীদের ইটের প্রহারে জীবন্ত সমাধি দিত। যেমন ফৈজিবাঈকে তার বিশ্বস্ত নয় বলে মনে হওয়ায় একটি ঘরে আটকে রেখে দরজা জানালা ইট দিয়ে গেঁথে হত্যা করেছিল। তাছাড়া আমেনা বিবির হত্যার প্রতিশোধ নিতে নারী মাত্রেরই সতীত্ব নাশ করত। প্রকাশ্য রাজপথে নরহত্যা করতে দ্বিধাবোধ হতো না তার। বহু রমণী সম্ভোগ করে এবং কাফের হত্যার মতো পুণ্যলাভের মতো আরবীয় মুসলমান চরিত্রের আদর্শ রূপে মনে করত। (সূত্র : Travels of Hindu, Holwell's India Tracts)। এমনকী যে রাজা মোহনলাল নবাবের বিশ্বস্ত সহচর ছিল তাঁর পরমা সুন্দরী বোন আলেয়াকেও নবাব তার শয্যাসঙ্গী করে হারেমে ঠাঁই দিয়েছিল। আর মোহনলাল তাঁর বিশ্বাসের মূল্য দিয়ে পলাশীর যুদ্ধে একমাত্র যোদ্ধা হিসেবে ইংরেজ বাহিনীর

প্রাণপণ যুদ্ধ করে জীবন ত্যাগ করেছিলেন। কথিত, এই আলেয়ার গর্ভে সিরাজের ঔরসে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সিরাজের অজ্ঞাতে আলেয়া সেই সন্তানকে পূর্ববঙ্গের এক হিন্দু পরিবারের বিশিষ্ট এক ভদ্রলোককে দত্তক দিয়েছিল।

এমননিতরো নানান কুকর্মের জন্য তদানীন্তন বাঙ্গালি হিন্দুদের কাছে সিরাজ-উদ্-দৌলা কেবল ইন্দ্রিয় পরায়ণ, দুশ্চরিত্র, অর্থ পিপাসু উশৃঙ্খল যুবক হিসেবে পরিচিত ছিল। সিরাজ তার অধঃপতনের সময়কালে অন্তঃপুরে বহু শত রমণীকে অঙ্কশায়িনী করে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় অবস্থান করত। তা ছিল গণনারও অতীত। এমনকী রাজসাহীর রানি ভবানীর মতো জমিদারের একমাত্র বিধবা পরমাসুন্দরী কন্যা তারার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে তাকে পাওয়ার জন্য সিরাজ-উদ্-দৌলা উত্তেজিত হয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় খবর রটে তারা ঠাকুরানির মৃত্যু হয়েছে এবং গঙ্গার তীরে এক চিতাকুণ্ডে দাহও করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয় তিনি তখনও জীবিত। শুধু সিরাজের হাত থেকে মুক্তি পেতে তা ছিল মৃত্যুর রটনামাত্র। এমনই ছিল নারীলোলুপ বদচরিত্রের মানুষ সিরাজ-উদ্-দৌলা।

আবার অন্যদিকে সরফরাজ খাঁ জগৎশেঠের পুত্রবধূকে লাঞ্ছিত করে অপমানিত করেছিল। এই মুসলমান নবাব ও শাসকদের কলঙ্কিত চরিত্রের জন্য বঙ্গের সমস্ত হিন্দু জমিদার ও ভূস্বামীরা তার বিরুদ্ধে সর্বনাশ সাধনে লিপ্ত হয়ে পড়েন। সেই সময়ে ইংরেজ, ফরাসি, দিনেমার ও ওলন্দাজ সকলেই বিদেশি বণিক, নবাব সরকারের সৌজন্যে বঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে নবাব মনসুরুল মুলখ সিরাজ-উদ্-দৌলা শাহকুলী খাঁ মিরজামোহাম্মদ হায়বত জঙ্গ বাহাদুর নাম ধারণ করে বঙ্গ-বিহার-ওড়িশার মসনদে আরোহণ করে। ইংরেজ বণিকরাও সিরাজকে নবাব বলে মেনে নেয়। এই সুযোগে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার করার জন্য কলকাতায় তাদের প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন। আর বাঙ্গালিরা মদ্যপ চরিত্রহীন সিরাজের উপর বিতৃষ্ণ হয়ে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় সিরাজ কাশিমরাজার কুঠি হস্তগত করে ইংরেজদের বিতাড়িত করে কলকাতা আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হলেন। তখন কলকাতার গভর্নর ছিলেন রোজার ড্রেক। ইংরেজরা ব্রিটিশ সেনার সাহায্যে নবাব বাহিনীর গতি রোধ করলে নবাব সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। কিন্তু ইংরেজ সেনা ভাগীরথীর তীরে দুর্গ রক্ষা করতে সমর্থ হলো না।

তারপর সিরাজ কলকাতা দখল করে জয়ের পতাকা উত্তোলন করে। আর কলকাতার নতুন নামকরণ করলো 'আলিনগর'। পরাজিত ইংরেজ যারা আত্মসমর্পণ করেছিল সেই সকল হতভাগ্য ইংরেজ নরনারীরা কারাকক্ষে বন্দি অবস্থায় নিদারুণ ভাবে মৃত্যু যন্ত্রণায় প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল। এটাই লোমহর্ষক 'অন্ধকূপ হত্যা' বলে কথিত। যদিও এর স্মরণে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে হলওয়েল সাহেব একটি স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করেন। কিন্তু আজ আর এই স্মৃতিস্তম্ভের কোনো চিহ্ন নেই। তবে কলকাতা জিপিয়োর গেইটের উত্তর পাশে একটি ফলক লিপি খোদিত রয়েছে মাত্র। তার পরবর্তী ইতিহাস তো পলাশীর যুদ্ধ। ধীরে ধীরে সিরাজের মতো চরিত্রহীন লম্পট দুশ্চরিত্র ইন্দ্রিয়াশক্ত অকর্মণ্য যুবক বঙ্গ-বিহার-ওড়িশার নবাব রূপে কল্পনা করাও দায় হয়ে পড়ে। আর এই বালখিল্য নবাবকে সিংহাসনে বসিয়ে রাখার প্রয়োজন মনে না করে তার সপারিষদ— রায় দুর্লভ, রাজ বল্লভ, জগৎশেঠ, উর্মিচাঁদ, এমনকী তার চাচা মীরজাফরও বিরোধিতায় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অপরিণামদর্শী নবাব সিরাজ যখন ইংরেজদের সঙ্গে পলাশীর আম্রকাননে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন তার সঙ্গে মাত্র মীরমদন আর মোহনলালের সেনারা সক্রিয় হয়েছিল যার পরিণতিতে ইংরেজদের হাতে সিরাজের পতন হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সে পথের ফকিরের মতো তার স্ত্রী লুৎফুন্নেসা বেগমকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

এই দুশ্চরিত্র নারী লোভাতুর লম্পট নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার স্মৃতির স্মরণে, স্থানীয় প্রশাসন সংখ্যালঘুদের তোষণার্থে ভোট বাক্সের লোভে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত শহরের কেন্দ্র স্থলে একটি লেক সমন্বিত মনোরম উদ্যানের নামকরণ করেছে 'সিরাজ উদ্যান'।

ইংরেজরা বঙ্গ দখল করে তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করলো। শূন্য সিংহাসনে মিরজাফরের পুরস্কার স্বরূপ ক্লাইভ কোম্পানি বাহাদুরের প্রতিনিধি হয়ে মিরজাফরকে বঙ্গের সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। আর মিরজাফরের অনুচরবর্গকে সঙ্গী করে তার ভাই মিরদাউদকে সিরাজের খোঁজে পাঠিয়ে দিয়ে সিরাজের হারেমের বেগমমণ্ডলীর রমণীদের সঙ্গে যুদ্ধাহত মোহনলাল ও সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিরজা মেহেন্দীকে কারারুদ্ধ করে। আবার সিরাজের খোঁজে তার মেয়ের জামাই মীর কাসেমকেও পাঠানো হলে দানশা নামে এক মুসলমান ফকিরের সাহায্যে সিরাজকে বন্দি করে মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। এই অবস্থায় মিরজাফরের পোষ্যপুত্র মীরণ তাকে গোপনে হত্যা করে। সিরাজ-উদ্-দৌলার জীবন সমাপনান্তে বঙ্গের এক কালিমালিপ্ত অধ্যায় সমাপ্ত হয়। এবার শুরু হলো বঙ্গের ভাগ্যাকাশে অন্য এক মুষলপর্ব। আর তার নায়ক হলো মিরজাফর আলি খাঁ ও মীর কাসেম। পরিশেষে যে কথা না লিখলে নয় তাহলো সেই তথাকথিত দুশ্চরিত্র নারী লোভাতুর লম্পট নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার স্মৃতির স্মরণে, স্থানীয় প্রশাসন সংখ্যালঘুদের তোষণার্থে ভোট বাক্সের লোভে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত শহরের কেন্দ্র স্থলে একটি লেক সমন্বিত মনোরম উদ্যানের নামকরণ করেছে 'সিরাজ উদ্যান'। কী বিচিত্র এই মনমানসিকতা সম্পন্ন বাঙ্গালি হিন্দুরা যাঁরা স্বাধীনতার মর্ম বুঝেও বোঝে না।

সূত্র :— ১. মুতক্ষরীণ (অনুবাদ), ২. চন্দ্রশেখর (বঙ্কিম রচনাবলী), ৩. সিরাজদ্দৌলা লেখক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, ৩. History of Bengal by Scotts, ৪. Stewart's History of Bengal, ৫. Bengal Army by Broome, ৬. Mill's History of British India Vol. III, ৭. Thompson's History of British India Vol. I, ৮. মহারাজা নন্দকুমার লেখক : শ্রী চণ্ডীচরণ সেন, ৯. সাহিত্য ষষ্ঠ বর্ষ— কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ড. ইউনুস বাংলাদেশের সকল শান্তিকামী মানুষের গলার কাঁটা

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

হত্যা, গুম, জ্বালাও-পোড়াও, লুণ্ঠন, শিল্প-সংস্কৃতি সব ধ্বংস করে দিয়ে অসভ্যতা, বর্বরতা, হিন্দুদের চাকরি থেকে বিতাড়িত ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ— কোনো কিছুই থেমে নেই বাংলাদেশে। জেলাগুলিতে নিরীহ মানুষের উপর নির্যাতন সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যে। পত্রিকার পাতায়, সামাজিক মাধ্যমে চোখ রাখলেই মানুষের চোখের জল, বুকফাটা আর্তনাদ স্পষ্ট। বাদ যাচ্ছে না শিশু নিপীড়নও। মঠ-মন্দির বাদ যাচ্ছে না চোখে পড়ছে। এ যেন এক অত্যাচারীর দেশ। উগ্র মোল্লাবাদী মুসলমানদের তাণ্ডবে শান্তিপ্রিয় মানুষ আতঙ্কের প্রহর গুনে চলেছে। হায়নারূপী জেহাদিদের জঙ্গিপনা অবর্ণনীয় মাত্রায় পৌঁছে গেছে অনেক আগেই। মুক্ত চারণভূমিতে অপরাধীরা এখন চষে বেড়াচ্ছে। দেশ চালাচ্ছে তারা।

আজকাল তথাকথিত সুশীল সমাজের লোকজনকেও তাদের সঙ্গে মিলতে দেখা যাচ্ছে। সাংবাদিকরা কলম শিকেয় তুলে রেখেছে। তাদের কলম থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। লিখতে পারছেন না, বলতে পারছেন না, এমনকী ফোন কল মনিটরিং করে কঠিন নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে বেঁধে দিয়েছে তাদের। ষড়যন্ত্র এত জঘন্য রূপ নিতে পারে কেউ ভাবতেও পারেনি। একটা দেশকে খাদের কিনারে টেনে নিয়ে গেছে ড. ইউনুস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ। একটা অস্থির পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। চলছে রাজনৈতিক সংকট। স্থিতিশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তানের উগ্রবাদী সংগঠনগুলির সমর্থনের কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল ও ভয়াবহ করে তুলেছে। তারা এখন দেশ বিভাগ নিয়ে বিতর্কিত পরিবেশ তৈরি করে পায়ে পাড়া দিয়ে এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনাশে দেশের সক্রিয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক নীতিকে উপেক্ষা ও জলাঞ্জলি দিয়ে সংস্কারের নামে দেশের ভিতকে বিনষ্ট করা হয়েছে। পেছনে তার কারণ হিসেবে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী মনোভাবকে অনেকাংশেই দায়ী করা হলেও শেখ হাসিনার কথিত স্বেচ্ছাচারিতা এ অবস্থার জন্য দায়ী বলে অনেকে অমূলক মনে করছেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থা আগেকার সকল শাসকদের অত্যাচারকে ছাড়িয়ে গেছে।

সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষতাও বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এর আগে সামরিক শাসনও দেখেছে দেশটি। সেনাদের রাজনীতি করার অভিলাষ সেদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হলেই তারা ফন্দিফিকির করে ক্ষমতা দখলের। বিদেশি সাহায্য ও খয়রাতি নির্ভর বাংলাদেশে কখনও সুষম উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোনো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। যার ফলে জেহাদি শক্তি সব সময় তৎপর থেকেছে। এখন তারা শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। দূরদূরান্তের দেশের প্রতি হাত প্রসারিত করার মানসে ইসলামি শাসন এবং আল্লার আইন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কলকাঠি নাড়াচ্ছেন ইউনুস। তার হাতে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিয়ে মর্জি মোতাবেক চালাচ্ছেন দেশ। তিনি যা চাইবেন আর বলবেন সেটি খণ্ডনের সাহস দেখাচ্ছেন না কেউ। দেশের উন্নতির সকল সোপান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটা ক্ষেত্রে মোল্লাবাদের ভিত রচনা করে দিয়ে পদস্থ আধিকারিকদের ইস্তফাদানে বাধ্য করিয়ে তাদের শেষ করার কাজ প্রায় শেষের দিকে। বাংলাদেশে কোথাও কোনো হিন্দু আধিকারিক আজ আর নেই। সেনাবাহিনীতে ও পুলিশে, এমনকী সাধারণ প্রশাসনেও হিন্দুদের এখন কোনো স্থান নেই। এ যেন হিন্দু নিধনের নতুন উপায়!

হাসিনা সরকারের সময়ে পুনর্বাসিত রোহিঙ্গা মুসলমানেরাও এখন পাকিস্তানকে সমর্থন করছে। হাসিনার এই রোহিঙ্গা মুসলমানপ্রীতি ছিল একটি ঐতিহাসিক ভুল। সেটি তিনি স্বীকার করেন বা না করেন, সত্য হলো রোহিঙ্গা মুসলমানেরাও জেহাদি, মোল্লাবাদীদের বাইরে কিছু নয়। এরই মধ্যে বড়ো সংখ্যক রোহিঙ্গা মুসলমান ভারতেও আস্তানা গেড়েছে। ভারতে ঢুকে তারা যে বসে নেই, সেটি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রতিক অশান্তির কারণ খুঁজলেই দেখতে পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গের মমতা সরকার তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে রাজ্য জুড়ে নীরবে গড়ে তুলছে তাদের আবাসস্থল।

সবকিছু বিবেচনা ও মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে, কুচক্রী ইউনুস অনেকটাই জাল বিস্তার করতে পেরেছেন। মাঝে মাঝে ইউনুসের মুখে গুরুগম্ভীর বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। তাতে সকলের সন্দেহ আরও তীব্র হচ্ছে। সুদ ব্যবসায়ী বলে বিশ্বখ্যাত এই নোবেলজয়ীর মুখে শান্তির কথা অকল্পনীয়। তাকে দিয়ে কোথাও শান্তির আবহ তৈরি অসম্ভব। তার একটাই মিশন, সেটি হলো আখের গোছানো। অবশ্য আমেরিকা তাকে ভালো চোখে দেখছে না। মার্কিন ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে তার কর্মকাণ্ড যে যথেষ্ট বিরক্তির কারণ সেটি স্পষ্ট। বাংলাদেশে শান্তি ও মানবাধিকার নিশ্চিত করতে ইউনুসকে চাপ দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু লাগাম ধরতে হবে আরও শক্ত হাতে। বাইডেন সরকার-পুষ্ট কুশীলবেরা এখনও সেখানে বহাল তবিয়তেই রয়েছে। তাদের অপসারণ এখন সময়ের দাবি।

বাংলাদেশের দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা অর্জনের দাবি পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়। নির্মমতা চালিয়ে ইউনুস এখন সারা পৃথিবীতে এক ঘৃণিত আতঙ্ক। তাকে থামানো এবং তার অকার্যকর পরিষদ ভেঙে দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা আশু সুরাহা প্রয়োজন। মোল্লাদের নোংরা, বিষাক্ত বক্তব্য থামাতে না পারলে সেটি অনেকটাই অসম্ভব। বিচার-বহির্ভূত হত্যা, এমনকী বিচারকের সামনেও যে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে চলেছে তা দেখে গোটা বিশ্ব হতবাক। জামিন অযোগ্য ধারায় চিন্ময় প্রভুকে জেলের ভিতর আটকে রেখে একগুঁয়েমি দেখিয়ে চলেছে। দেশের আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সারা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এটা নাকি সংস্কার চলছে। এভাবেই নাকি সংস্কার চলে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে সংখ্যালঘুদের মুক্তির জন্য পৃথিবীর সর্বত্র দাবি উঠেছে। সেদিকে কর্ণপাত না করে বাংলাদেশে প্রশাসনের দ্বারা একতরফা আইন উল্লঙ্ঘন কারও কাছেই ভালো ঠেকছে না। ইউনুস সরকার এখন বাংলাদেশের গলার কাঁটা। সেটি উপড়ে ফেলতে না পারলে দ্বিতীয় আফগানিস্তানে পরিণত হবে বাংলাদেশ। কাজটি যদিও ততটা সহজ নয়, তবুও বৃহত্তর স্বার্থে সেটির কোনো বিকল্প নেই। সময় আসছে গলার কাঁটা তুলে ফেলার। কাজটিও শুরু হয়েছে বলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের ধারণা। এই ধারণা বাস্তবে প্রতিফলিত হোক— গোটা বিশ্ব সেদিকেই তাকিয়ে। □

মহাকুম্ভে ষড়যন্ত্র : অপারেশন ১২০

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে মৌনী অমাবস্যার স্নানে ত্রিবেণী সঙ্গমের কাছেই ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনা মহাকুম্ভের ব্যবস্থাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে। কড়া নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে ঘটে গেল এই ঘটনা, তা নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে ভয়ংকর তথ্য। মৌনী অমাবস্যার কয়েকদিন আগে থেকেই মহাকুম্ভে কোটি-কোটি পুণ্যার্থীর ভিড় উপচে পড়তে শুরু করে, যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন প্রায় অসমর্থ হয়ে পড়ে। নতুন করে ব্যারিকেডিং, সিসিটিভি ক্যামেরা, ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে নিরাপত্তা-সহ অন্যান্য ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। বেশ কয়েকজন আধিকারিক-সহ মুখ্যমন্ত্রী নিজে সারা রাত কন্ট্রোলরুমে বসেছিলেন।

মৌনী অমাবস্যার পবিত্র ক্ষণে সঙ্গম ঘাটের কাছে হঠাৎই ভিড় অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছুটে আসে। কিছু পুণ্যার্থী রাত থেকেই ঘাটের কাছেই শুয়েছিলেন। পুলিশের বারবার সতর্কবার্তা সত্ত্বেও অনেকেই নিয়ম না মেনে ব্যারিকেড ঠেলে ঘাটের দিকে এগোতে থাকে। সেসময় পদদলিত হয় বেশ কিছুজন। ঘটনায় ৩০ জন নিহত এবং প্রায় ৬০ জন আহত হন। দুর্ঘটনার পরই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ভবিষ্যতে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র ফাঁক যাতে না থাকে তার জন্য বড়ো আধিকারিক দল মেলা চত্বরে নিযুক্ত করেন। ভিভিআইপিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে সাধারণ মানুষের জন্য থাকার এবং চলাচলের জায়গার সংস্থান করা হয় এবং তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। তদন্তকারী দল তাদের কাজ শুরু করতেই উঠে আসে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। দুর্ঘটনার পিছনে একটি গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলেই তদন্তকারী দল মনে করছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও আহতদের বক্তব্যে উঠে এসে এসেছে, এক দল লোকের কথা যারা লাল পতাকা নিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। নীচে পড়ে যাওয়া মানুষদের উদ্ধারের বদলে তারা মানুষজনকে পায়ে মারিয়েই এগোতে থাকে। সিসিটিভি ক্যামেরা ও ড্রোন ক্যামেরার ছবি থেকে ১২০ জন সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তদন্তকারী দলের 'অপারেশন ১২০' নামে এই তদন্ত প্রক্রিয়ায় আহত ও আহতদের পরিজন ছাড়াও বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী, দোকানদার, কর্মী, বিভিন্ন ব্যবস্থায় থাকা লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

মালদ্বীপের প্রতি ভারতের সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি মালদ্বীপের দুর্বল অর্থনীতির বিষয়ে ভারত গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর নেতৃত্বাধীন মালদ্বীপ ক্রমাগত এমন সব বাণিজ্যিক চুক্তি করে চলেছে যা তার আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটাতে পারে। এমতাবস্থায়, ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক গত ৩১ জানুয়ারি একটি বিবৃতি জারি করে বলেছে সাম্প্রতিক চুক্তিগুলি মালদ্বীপের রাজস্ব ভাণ্ডারকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব দেশটির আর্থিক স্থিতিশীলতাকে বিপদের মুখে ফেলতে পারে। ভারত অন্য কোনো দেশের নাম না করলেও, এটা স্পষ্ট যে নয়াদিল্লির ইঙ্গিত ছিল চীন ও তুরস্কের প্রতি, সম্প্রতি যাদের সঙ্গে মালদ্বীপের বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মালদ্বীপের অর্থনীতি সংকটের সম্মুখীন। ৭.৮ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির এই দ্বীপ দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে এবং ঋণের বোঝা ক্রমশ বাড়ছে। চীন মালদ্বীপকে ১.৩৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে। যার কারণে চীনের ওপর মালদ্বীপের অর্থনৈতিক নির্ভরতা প্রত্যক্ষভাবে বাড়ছে। গত ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়া চীন-মালদ্বীপ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) দেশটির বাণিজ্য ভারসাম্যকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই চুক্তি মালদ্বীপের শুল্ক ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলার পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন (বা সরবরাহ ব্যবস্থা)-কেও অস্থিতিশীল করতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এছাড়া তুরস্কের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, এই চুক্তিগুলি মালদ্বীপের রাজস্ব সংগ্রহ এবং কোষাগারে প্রভাব ফেলবে, যা দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য ভালো লক্ষণ নয়। গত বছর মালদ্বীপের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে ভারত ৪০০ মিলিয়ন ডলার আর্থিক সাহায্য এবং তিন হাজার কোটি টাকা (৩৪৬ মিলিয়ন ডলার) মূল্যের মুদ্রা অদলবদল করেছে। তা সত্ত্বেও, মুইজ্জু প্রশাসন চীন-ঘনিষ্ঠ হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটেও মালদ্বীপের উদ্দেশ্যে ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছেন ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সম্প্রতি রেটিং এজেন্সি মুডিসও সতর্ক করেছে যে মালদ্বীপকে তার আর্থিক চাহিদা মেটাতে বাইরের সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হবে। এখন ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মালদ্বীপের অর্থনীতির ক্ষতি করছে এমন চুক্তগুলিকে তারা হালকাভাবে নেবে না। মুইজ্জু সরকার এই সতর্কতাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে, নাকি চীনের ঋণের জালের আরও আটকে যেতে থাকে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

শোক সংবাদ

কলকাতা উল্টাডাঙ্গা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক কমল সাহা গত ১০ জানুয়ারি ব্যাঙ্গালোরে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী এবং ১ পুত্র-সহ বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। তিনি প্রথমে গোয়াবাগান শাখায় স্বয়ংসেবক হন, পরে উল্টাডাঙ্গা শাখার দায়িত্ব পালন করেন। কর্মসূত্রে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে থাকার সময় সেখানেও সঙ্ঘকাজে যুক্ত ছিলেন।

দক্ষিণ কলকাতার পাটুলী নগরের সহ কার্যবাহ সুশান্ত চৌধুরীর সহধর্মিণী বর্ণালী চৌধুরী গত ২৫ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। তিনি একমাত্র কন্যাকে রেখে গেছেন।

পদ্মশ্রী নগেন্দ্রনাথ রায়কে সংবর্ধনা

সংবাদদাতা॥ রাজবংশী ভাষায় রামায়ণ লিখে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হলেন রাজবংশী ভাষার বিদগ্ধ পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ রায়। গত ৩১ জানুয়ারি মাধব ভবনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত।

উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়, নকশালবাড়ি বিধানসভার বিধায়ক আনন্দময় বর্মণ-সহ সঙ্ঘের আরও বিশিষ্ট কয়েকজন কার্যকর্তা। এদিন শ্রী দত্ত তাঁকে শাল পরিয়ে সংবর্ধনা জানিয়ে তাঁর হাতে ভারতমাতার ছবি তুলে দেন। ভুবনজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক নগেন্দ্রবাবু ভারত সরকারের এই পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্তকে আশাতীত বলে বর্ণনা করেন। রামায়ণকে রাজবংশী জনসমাজের কাছে তুলে ধরতে তাঁর এই প্রচেষ্টা, কিন্তু তার জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কার পেতে পারেন তা তিনি কল্পনাতেও করেননি। ২০২৫-এর পদ্মশ্রী সম্মানের সূচিতে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। তাঁর লেখা রাজবংশী রামায়ণ আগামী বাংলা নববর্ষের দিন আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হতে চলেছে। এছাড়াও তিনি ৭০টিরও বেশি পুস্তকের রচনা করেছেন।

সাহিত্যে অনন্য কীর্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক শিক্ষারত্ন (২০১১), রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের ভগীরথ সম্মাননা, সংস্কার ভারতী দ্বারা সরস্বতীর বরপুত্র সম্মাননা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজবংশী ভাষা আকাদেমি পুরস্কার (২০১৫), প্রসার ভারতী শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্র কর্তৃক সম্মাননা (২০১৯) প্রদান করা হয়েছে। পদ্মশ্রী পুরস্কার তাঁর মধ্যে অন্যতম সম্মান রূপে যুক্ত হলো। শিলিগুড়ি মাধব ভবনে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনাতে অদ্বৈতচরণ দত্ত তাঁকে উত্তরবঙ্গের গৌরব বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, রাজবংশী সাহিত্যে তাঁর এই অবদান অনন্য কীর্তি রূপে সর্বদা অক্ষয় থাকবে।

দু'টি উপগ্রহের সফল সংযোজনে ভারত পেল বিশ্বের চতুর্থ দেশের শিরোপা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মহাকাশে দু'টি স্পেসক্র্যাফ্ট বা মহাকাশযানের সংযুক্তির প্রক্রিয়াকে 'স্পেস ডকিং' বলা হয়। গত ১৬ জানুয়ারি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো ছুঁয়েছে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। ইসরোর স্পেড-এক্স মিশনের (SpaDeX mission) অধীনে 'চেজার' ও 'টার্গেট'-নামক দু'টি উপগ্রহ গত ৩০ ডিসেম্বর উৎক্ষেপণ করে ইসরো। গত ১৬ জানুয়ারি মহাকাশে এদের স্পেস ডকিঙের প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ইসরোর দ্বারা সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে প্রস্তুত 'ভারতীয় ডকিং সিস্টেম'-এর উদ্ভাবন এবং তার সাফল্যের ফলে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অধিকারী হিসেবে আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের পর বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেল ভারত। স্পেস স্টেশন নির্মাণ, মহাকাশযাত্রী-সহ মহাকাশযান প্রেরণ (ক্রু'ড মিশন) ইত্যাদির ক্ষেত্রে ডকিং প্রযুক্তি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মহাকাশে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল বা মহাকর্ষ খুবই কম হওয়ার দরুন সেখানে মাইক্রোগ্র্যাভিটি পরিস্থিতি

রয়েছে। কক্ষপথে আবর্তনরত বিভিন্ন উপগ্রহ ও মহাকাশযানে জ্বালানি ভরার ক্ষেত্রে এবং মহাকাশে মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে মহাকাশ স্টেশন সম্পর্কিত ভারী পরিকাঠামো (হেভি ইনফ্রাস্ট্রাকচার) একত্রীকরণের মতো বিষয়ের ক্ষেত্রে স্পেস ডকিং টেকনোলজি (মহাকাশ ডকিং প্রযুক্তি) গুরুত্বপূর্ণ সহায়তাদান করে।

ভারতীয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান পিএসএলভি-সি৬০ দ্বারা ইসরো নির্মিত স্যাটেলাইটদ্বয়— এসডিএক্স০১ (চেজার) ও এসডিএক্স০২ (টার্গেট) গত ৩০ ডিসেম্বর মহাকাশে উৎক্ষেপিত হয়। এরপর ইসরো টেলিমেট্রি, ট্র্যাকিং অ্যান্ড কমাণ্ডিং নেটওয়ার্ক বা ইসট্র্যাক-এর অন্তর্গত মিশন অপারেশনস্ কমপ্লেক্স (এমওএক্স)-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাকাশবিজ্ঞানী ও আধিকারিকরা দু'টি স্যাটেলাইটের ডকিঙের জটিল প্রক্রিয়াটি নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। গত ১৬ জানুয়ারি আসে সাফল্য। স্পেড-এক্স মিশন হলো দু'টি ছোটো উপগ্রহ ব্যবহার করে বিভিন্ন মহাকাশযানের সম্মেলন, ডকিং (সংযুক্তি) ও আনডকিঙের (বিযুক্তির) জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তার কার্যকারিতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ইসরো কর্তৃক গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প।

প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভমেলায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, পুণ্যার্থীদের সহায়তাদান ও সেবাকাজে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের অংশগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৯ জানুয়ারি, মৌনী অমাবস্যা তিথিতে প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত পূর্ণমহাকুম্ভমেলায় পুণ্যস্নানের ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৩০ জন পুণ্যার্থী প্রাণ হারান এবং প্রায় ৬০ জন আহত হন। এই বেদনাদায়ক এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনাটি বাদ দিলে মহাকুম্ভমেলায় এখনও পর্যন্ত বড়ো দুর্ঘটনা ঘটেনি। কোটি কোটি পুণ্যার্থীর সমাবেশে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, কুম্ভমেলায় আগত পুণ্যার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তাদান ও সেবাকাজে যোগদান করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ১৬ হাজার স্বয়ংসেবক।

মহাকুম্ভমেলায় সাফাই ও স্বচ্ছতা অভিযান, স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদান, খাদ্য পরিবেশন, নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ এবং আশ্রয়হীন তীর্থযাত্রীদের জন্য থাকার ব্যবস্থার মতো বিভিন্ন সেবাকাজে তাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন। নিরন্তরভাবে তাঁরা করে চলেছেন যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা-সহ কুম্ভমেলায় আগত পুণ্যার্থীদের নানা অত্যাবশকীয় পরিষেবাদান। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও মোড়গুলিতে স্বয়ংসেবকরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন। পুণ্যার্থীদের রাস্তা ও গন্তব্যস্থল খুঁজে পেতে সাহায্য করা ছাড়াও স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে সবরকম সমন্বয় রক্ষা করে যানবাহন চলাচল এবং পথচারীদের যাতায়াত সুগম করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। মহাকুম্ভমেলা শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই সেবাকাজের লক্ষ্যে শুরু হয় স্বয়ংসেবকদের প্রস্তুতিপর্ব। কোটি কোটি পুণ্যার্থীর সমাগমের কারণে কুম্ভমেলায় যানজট একটি বড়ো সমস্যা। ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং যানবাহন চলাচল মসৃণ করার ব্যাপারে স্বয়ংসেবকরা বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জাতীয় স্তরের এই মহাসম্মেলনে এসে পুণ্যার্থীরা যাতে অসুবিধার সম্মুখীন না হন, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাঁরা যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কুম্ভমেলায় আগত পুণ্যার্থীদের জন্য অস্থায়ী শিবির গড়ে তুলেছে প্রয়াগরাজ জেলা প্রশাসন। পুণ্যার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার রয়েছে উন্মুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর জুড়ে স্থাপিত হয়েছে অসংখ্য তাঁবু। বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে তীর্থযাত্রীরা জমায়েত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেটে কর্তব্যরত স্বয়ংসেবকরা তাঁদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করছেন। মহাকুম্ভমেলায় ভিড়ের চাপে দুর্ঘটনা হওয়ার পর মহাকুম্ভমেলার এলাকা জুড়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা আরও সচেতনতা ও তৎপরতা গ্রহণ করেছেন। ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে তাঁরা সক্রিয়ভাবে ভিড় ও যান নিয়ন্ত্রণের কাজে প্রশাসনকে সহযোগিতা করে চলেছেন। মহাকুম্ভমেলার নয় নম্বর সেক্টরে কলস দ্বার এবং সাত নম্বর সেক্টরে সূর্যদ্বারে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করে চলেছেন। সঙ্ঘের বেলাকাছার, ফাফামৌ এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নগরের স্বয়ংসেবকরা কুম্ভমেলায় আগত পুণ্যার্থীদের জন্য খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করেছেন। দারাগঞ্জের রজ্জু ভাইয়া নগর এবং সুবেদারগঞ্জের স্বয়ংসেবকরাও তীর্থযাত্রীদের জন্য প্যাকেটজাত খাবার ও চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করেছেন। সঙ্ঘের কাশী প্রান্তের প্রান্ত প্রচার প্রমুখ ড. মোরারজী ত্রিপাঠী সংবাদমাধ্যমকে জানান, প্রতাপগড়, সুলতানপুর, বারাণসী ও মির্জাপুর— অর্থাৎ, প্রয়াগরাজের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে যে তীর্থযাত্রীরা অবস্থান করছেন, সঙ্ঘের কার্যকর্তারা তাঁদের দিকেও নানাভাবে বাড়িয়ে দিয়েছেন সহযোগিতার হাত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, সঙ্ঘ সমগ্র ভারতের হিন্দুসমাজকে কুম্ভমেলার বিষয়ে সুসংসহত ও পরিশীলিত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তারা মহাকুম্ভমেলায় সেবাকাজ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে দায়বদ্ধ বলে তিনি জানিয়েছেন। কুম্ভমেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের যেকোনো উপায়ে সহায়তাদানে তাঁরা সচেতন ও সংকল্পবদ্ধ বলেও তিনি জানান। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য প্রশাসন, জেলা পুলিশ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রয়াগরাজে আয়োজিতপূর্ণমহাকুম্ভমেলা হয়ে উঠেছে এক শান্তিপূর্ণ, সুসংগঠিত মহাসম্মেলন। লক্ষ-লক্ষ পুণ্যার্থী সাক্ষী থাকলেন এক আধ্যাত্মিক অনুভবের জয়যাত্রার। পবিত্র ও নিরাপদ অমৃতস্নানের অভিজ্ঞতা সম্বল করে সম্পন্ন হলো তাঁদের তীর্থযাত্রা।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

সূর্যোদয়

ভোঁসলেদের রাজধানী নাগপুরে সেদিন মেতে উঠেছে গুড়ী পরবের আনন্দে। গুড়ী শব্দের অর্থ বিজয় পতাকা। শক বিজতো সম্রাট শালিবাহনের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে লম্বা বাঁশের মাথায় নান রঙিন রেশমি কাপড় টাঙিয়ে দণ্ডাগ্রে একটি রৌপ্য বা তাম্রপাত্র বেঁধে রাখা, যা প্রাচুর্য বা উর্বরতার প্রতীক। সঙ্গে আমপাতা, নিমপাতা, ফুল-মালা দিয়ে সুসজ্জিত করা হয় বংশদণ্ডটি। প্রতিটি গৃহপ্রাঙ্গণ সেজে ওঠে আলপনায়। কাহিনির দিনটি ছিল চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ তিথি, শক সম্বৎ ১৮১১। ইংরেজি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল। শবরী অবসানে ঊষার আলো ধরিত্রী স্পর্শ করার পুণ্যমুহূর্তে বেদশাস্ত্রী ব্রাহ্মণ বলিরামপন্থ হেডগেওয়ারের গৃহে পর পর কয়েকবার মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল। বলিরামপন্থ ছিলেন অগ্নিনারায়ণ উপাসক, ঋগ্বেদ অধ্যেতা, নাগপুরের স্বনামধন্য শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। দারিদ্র্য সংবলিত পৌরোহিত্য জীবিকা হলেও শাস্ত্রবিহিত কর্মে তাঁর নিষ্ঠা ও ত্যাগের কথা ছিল বহুজন বিশ্রুত। এই হেডগেওয়ার পরিবারের পূর্বপুরুষ একসময় বাস করত মহারাষ্ট্র-অন্ধ্র সীমান্তের কুন্দকুর্তী গ্রামে। বেদ সমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছিল তাদের মূল কর্ম। কিন্তু মুঘল শাসকদের হিন্দুদের প্রতি বিমাতৃসুলভ মনোভাব, অবজ্ঞা, অবহেলার জন্য প্রায় দেড়শো বছর আগে কোনো সময় বহু ব্রাহ্মণ পরিবার ভোঁসলেদের রাজ-সীমানায় চলে আসে। বলিরামপন্থের পিতামহ নরহরি শাস্ত্রী নাগপুরে এসে নতুন জীবন শুরু করেন। অর্থের প্রাচুর্য না থাকলেও শাস্ত্রজ্ঞান, সততা, নিষ্ঠা ও ধর্মবোধের প্রাচুর্যে ভরপুর বলিরামপন্থ হেডগেওয়ারের গৃহে ঊষাগমের পুণ্যলগ্নে উত্থিত শঙ্খধ্বনির সংকেতে সবাই বুঝতে পেরেছিল যে হেডগেওয়ার গৃহে নবজাতকের আবির্ভাব ঘটেছে। বলিরামপন্থের এই পুত্রলাভ বুঝি প্রকৃতিতে ঊষার আলোর মতো সমাজে নতুন সূর্যোদয়ের প্রতীক। হিন্দু বিজয় দিবসে আবির্ভূত হয়ে শিবাজীর আদর্শে ভবিষ্যৎ হিন্দু-চেতনার, হিন্দু জাগরণের অগ্রদূত হবে এই পুত্র। এমনই সংকেত সবাই অনুভব করছিল। তখন পূর্ব দিগন্তে নবোদিত সূর্যকিরণে নাগপুরের পথে-পথে ঘরে-ঘরে সুসজ্জিত বিজয়ের গুড়ীর রঙিন বস্ত্রখণ্ডগুলি এক নবীন উজ্জ্বলতা আনন্দ নিয়ে আন্দোলিত হচ্ছিল। শ্রীবলিরামপন্থ পুত্রের নাম রাখলেন কেশব।

(২)

বাল্যস্মৃতি

কেশব ছিল হেডগেওয়ার পরিবারের তৃতীয় পুত্র। মহাদেব শাস্ত্রী ভাইদের মধ্যে বয়সে অনেকটাই বড়ো ছিলেন, তারপর সীতারাম এবং সর্বকনিষ্ঠ কেশব। তাদের তিন বোন ছিল সরু, রাজু ও রঙ্গু। মহাদেব শাস্ত্রীকে বিদ্যাগ্রহণের জন্য কাশীতে সংস্কৃত বিদ্যাকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল। অপরদিকে ছোট দুই ভাই সীতারাম ও কেশব ভর্তি হয় স্থানীয় পাঠশালায়। পড়াশোনার পাশাপাশি চলতো শরীরচর্চা, খেলাধুলা। বড়দা মহাদেব শাস্ত্রী নিজে বড়ো পালোয়ান ছিলেন। তাই ভাইদেরও ব্যায়াম, কুস্তি, মলখম্ব এইসব করতে বাধ্যই করতেন। পাড়ার দুষ্ট লোকদের কাছে মার খাওয়ার চেয়ে বেশি ভয় ছিল দাদার সামনে দাঁড়ানো। তাই মার খেয়ে আসা যাবে না, মার দিয়েই আসতে হবে। এসবের সঙ্গে বাড়িতে নিত্য চলতে থাকে বিভিন্ন শ্লোক, স্তোত্র, রামরক্ষা মন্ত্র পাঠ ও নিত্যপূজা।

বেশ কাটছিল ছোটো ছোটো বন্ধুদের সঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধুলা করে। তখন কেশবের বয়স আট কিংবা নয় বছর। সেই আনন্দে সময়ে হঠাৎই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় কেশব। পিতা-মাতার অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষায় প্রাণরক্ষা হয় কিন্তু কেশবের মুখমণ্ডল জুড়ে থেকে যায় বসন্তের চিহ্ন।

কেশবের যজ্ঞোপবীত সংস্কারের পর বেদপাঠ, সান্ধ্যাহ্নিক, ব্রহ্মকর্ম ও পূজনকার্যে দক্ষ হয়ে ওঠে। মারাঠি বইও ভালোই পড়তে শিখে গেছে। ছোটো থেকেই নিষ্ঠাবান, সাহসী, জেদি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব সরল মনের অধিকারী ছিল। একবার একটা মজার ঘটনা ঘটে।

সেদিন কোনো এক যজমানের বাড়ি থেকে পূজার কাজ সেরে ফেরবার পথে পাঁচিলে লাগানো অনেকগুলি প্রচারপত্র দেখতে পায়। তাতে লেখা রয়েছে 'বিক্রম শশিকলা'। কিন্তু কেশব এটিকে পড়লো 'বিক্রম শ শিকলা'। মারাঠিতে যার মানে 'বিক্রম শ শিখেছে'। আসলে এটি ছিল একটি নাটকের একটি পোস্টার, কিন্তু কেশব অতশত না বুঝে পড়লো 'বিক্রম শ শিখেছে'। তার মনে হলো বিক্রম শ শিখেছে তা আর এমন বড়ো কথা কী! সে-ও তো অনেক কিছু পড়তে শিখেছে। বাড়িতে এসে একথা বলায় সবার মধ্যে হাসির রোল পড়ে যায়।

(সংকলন : বিমলকৃষ্ণ দাস)